নিঃসঙ্গ মানুষ

সাঈদ খান সাচ্চু

রঙধনু

প্রথম প্রকাশঃ
জুন ০৬/২০০৭ইং

কপিরাইট© সাঈদ খান সাচ্চু

প্রকাশক
ডায়মন্ড হীরা

প্রকাশ মাধ্যম
www.sachchu.blog.co.uk

কম্পিউটার কম্পোজ
সাঈদ খান সাচ্চু

Nihsongo Manush
(A man without company)
Written By
Saeid Khan Sachchu

Published By
Diamond Hera

উৎসর্গ

নিজের পরিবারের মধ্যে থেকেও যারা একা

সবার সবাই আছে।শুধু আমার কেউ নেই। কখনো কেউ ছিলও না! কিন্ত কেন? আমিও তো কারও পেটেই জন্মেছি। তাহলে কেউ নেই কেন? এমন হাজারও প্রশ্ন আমাকে আজও তাড়া করে বেড়ায়। উত্তর পেয়েছি যা খুশী হতে পারিনি তাতে। এমন তো হবার কথা নয়। মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মেছি। কিন্ত হত দরিদ্র পরিবারের সমস্ত উপসর্গই ছিল আমার পরিবারে। অন্তত মন ও মননে। যা থাকার কথা নয়।

বাবা লেখাপড়া যতটুকু করেছেন ওই সময়ে এর চেয়ে বেশী লেখাপড়া জানা লোক খোঁজে পেতে কষ্ট করে আশ পাশের কয়েক গ্রাম খুঁজতে হত। বাবা চাকরী করতেন কোলকাতা দাদার সাথে। শুনেছি সে সময়ে আমাদের আর্থিক অবস্থা খুবই ভাল ছিল। আমার একমাত্র চাচা তার বড় ভাইয়ের পয়সায় বাইচ দেওয়ার নৌকা পাগলা গরু সবই দাবড়িয়েছেন। উল্লেখ্য ওই সময়ে এই দুটি মাধ্যম ছিল বিনোদনের অন্যতম সেরা মাধ্যম। আমরা ছয় ভাই এক বোনের কেউই তখনও পৃথিবীতে পা রাখিনি। বাবার বিয়ের অনেক দিন পর বহু চিকিৎসার পরে আমার বড় বোনের জন্ম হয়। ততদিনে আমার ছোট চাচা দুই সন্তানের পিতা! বোনের ভূমিষ্ঠের খবর পেয়ে বাবা কোলকাতা থেকে উড়ে এলেন ঢাকায় উড়োজাহাজে চড়ে! কিছুকাল আগ পর্যন্তও গ্রামের প্রবীণদের মুখে শুনেছি,

"এই গ্রামে তোমার বাবাই প্রথম উড়োজাহাজে চড়েছে।"
এসবই আমার শুনা কথা।

তিন বৎসর অন্তর আমরা একে একে পৃথিবীতে আসা শুরু করলাম। আমার বাবাও গরীব হতে শুরু করলেন! নুন আনতে পান্তা ফুরায় যখন অবস্থা তখন আমাকে স্কুলে ভর্তি করে দিলেন বাবা। পকেটে পয়সা নেই। অর্ধপেট খাবার খেয়ে স্কুলে যাই। বই আছে তো খাতা নেই! কলম আছে তো কালি নেই অবস্থা। কেবল একটা জিনিসেই শুধু ঘাটতি ছিল না সেটি হল লেখাপড়া শিখানোয় বাবার আন্তরিকতা। স্কুলে না যাওয়ার কারণে একদিন কি মারটাই না আমাকে মারলেন! রশি দিয়ে বেঁধে ঘরের আঁড়ার সাথে ঝুলিয়ে! মারতে মারতে বললেন, "হারুর পোলা স্কুলে যায় আর তুই স্কুলে না যাইয়া গু লি খেলছ!" সেই থেকে আর স্কুল কামাই করিনি। খুব ভাল রেজাল্ট করছি প্রতি বছর। হারুর ছেলেকে ডিঙ্গিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি। বাবা আর একদিনও আমাকে স্কুলে যেতে বলেননি! ব্যাটারি ড্যামেজ গাড়িকে ধাক্কা দিয়ে চালু করে দিয়ে যেন তাঁর কাজ শেষ!

১৯৮৩ সাল। অগাষ্ট মাসের ২৩ তারিখ। বাবা আবুধাবীর উদ্দেশ্যে বাড়ি ছাড়লেন। কয়েক বৎসরের চেষ্টার ফসল তাঁর এই বিদেশ যাত্রা। তখন বিছানা ছেড়ে এক পলের জন্যেও উঠতে পারিনা। টাইফয়েড আমার সার্বক্ষণিক সঙ্গী। বাবা দেশ ছাড়ার এক মাস পর তিন মাস অসুখে ভোগে ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠলাম। এখন পর্যন্ত ওটাই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় অসুখ। শুনেছি টাইফয়েড শরীর ত্যাগ করার সময় সাথে করে কিছু একটা নিয়ে যায়। আমার কিছুই নেয়নি বলে অবাক হয়েছি।

কয়েক মাস পর বুঝতে পারলাম টাইফয়েডের কাছে আমি কি হারিয়েছি। পড়তে বসতে ইচ্ছে করে না। কখনও কখনও জোর করে পড়ার টেবিলে বসতাম। উঠতে ইচ্ছে করলেও জোর খাটিয়ে বসে থাকতাম! পড়ার চেষ্টা করতাম। কিন্তু কিছুই মনে রাখতে পারতাম না। তখন আমি নবম শ্রেণীর সেকেন্ড বয়। সে বছর আর ফাইনাল পরীক্ষা দেওয়া হল না। অন্যান্য শিক্ষকদের সাথে প্রধান শিক্ষকও বললেন, "চিন্তার কিছুই নেই, আমরা তোমাকে দশম শ্রেণীতে প্রমোশন দিয়ে দেব।"

তাঁরা আমাকে প্রমোশন দিলেন। নতুন ক্লাশে যাই কিন্তু ভাললাগে না। ক্লাশে আর আগের মত আনন্দ পাই না। প্রথম বেঞ্চে বসতে ইচ্ছে করে না! পড়া পারি না! লজ্জা পাই। স্কুল আর আমাকে টানে না। দীর্ঘদিনের চেনা স্কুল, সহপাঠী বন্ধু এবং শিক্ষকদের থেকে দূরে দূরে থাকতে

ভাললাগে। খাই দাই ঘুরে বেড়াই। সময় কখনও কাটে কখনও কাটে না। অবহেলায় দিন যায়।
পরিচিত পরিমন্ডলের বাইরে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি।

ভাবলাম কিছু একটা করলে ব্যস্ত সময় ভাল কাটবে। বাবা বিদেশে। আমি বড় ছেলে। টাকা কড়ি নাড়াচাড়ার সুযোগ আছে। বাংলাদেশের বেশ কয়েকটি জেলা ঘুরে বেড়ালাম চাকরীর খোঁজে। শ্রীমঙ্গল হয়ে জাফলং। চট্টগ্রাম হয়ে কাপ্তাই, কক্সবাজার দূর দূরান্তে। যেখানে পরিচিত কারও চেহারা আমার চোখে পড়বে না। কি কারণে যেন হকাররা তখন জনকন্ঠ বিক্রী করে না। কিসের ভিত্তিতে যেন এজেন্ট নিয়োগ দিচ্ছে পত্রিকাটি। জনকন্ঠের অফিসে খোঁজ নিয়ে জানলাম শুধুমাত্র কক্সবাজার জেলায় এজেন্ট নিয়োগ বাকী আছে। যোগাযোগ করলাম জনকন্ঠের কক্সবাজার সংবাদদাতার সঙ্গে। তিনি আমার কথা শুশে অবাক হলেন। কারণ তিনি স্থানীয় লোক এবং পত্রিকাটির সংবাদদাতা হয়েও এজেন্ট হওয়ার সাহস পাচ্ছেন না স্থানীয় হকারদের ভয়ে। আর আমি কিনা ষোল বছরের একটি ঢাকার ছেলে হয়ে এখানে এসেছি ব্যবসা করতে! তিনি যা বললেন তাতে আমার আর এগুশো হলো না।

বই পত্র পত্রিকা পড়ার অভ্যাস খুব ছোটবেলা থেকেই আমার ছিল। এ বাড়িতে এ রকম বদ অভ্যাস আর এক জনেরও নেই। এক টুকরো ছেঁড়া ফাটা ময়লা কাগজ দেখলেও রাস্তা থেকে কুড়িয়ে নিয়ে তা পড়তাম। আমার সাথে তাই কেউ বেরুতে চাইত না। নিয়মিত শুরুটা হয় শরৎ সাহিত্য দিয়ে। কোথায় যেন দৈনিক আজকের কাগজের সাপ্তাহিক প্রকাশনা খবরের কাগজ পড়ি। অসম্ভব ভাল লেগে যায়! নিয়মিত পড়ি। প্রতিটি সংখ্যার প্রতিটি শব্দ! একবার একটি সংখ্যা কি কারণে যেন মিস হয়ে যায়। তার জন্যে আমি গ্রাম থেকে শহরে গিয়েছিলাম আজকের কাগজের অফিসে! পুরোনো সংখ্যার দ্বিগুণ দাম সেদিনই আমি প্রথম জানতে পারি। মন ও মননে আমি হয়তো নাস্তিক হয়েই জন্মেছিলাম। তাই মায়ের রোজা রাখার আদেশ কিংবা বাবার নামাজ পড়ার হুকুম উপেক্ষা করতে পারতাম ছোট বেলাতেই। একদিন মা বলেছিল, "পোলাপানে তো সখ কইরাও দুই চারটা রোজা রাখে।" যা হোক আমার সেই নাস্তিকতার চারাগাছকে সার পানি পরিচর্যা দিয়ে বড় করেছে সাপ্তাহিক খবরের কাগজ। বিকশিত করেছেন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, হুমায়ূন আজাদ, আহমদ শরীফ, প্রবীর ঘোষ, ভবানী প্রসাদ সাহু এবং আরও অনেকে।

ছোট বেলা থেকেই ছড়া কবিতা লিখার অভ্যাস ছিল। পত্রিকাতে ছাপাও হয়েছে অনেক। বিবিসি'র প্রীতিভাজনেষু চিঠিপত্র জবাবের অনুষ্ঠানে কত চিঠি

লিখেছি! জবাবও পেয়েছি। মিডিয়াতে নিজের নাম দেখলে শুনলে কিযে ভাল লাগত! ভাল ছাত্র ছিলাম বলে সবারই ইচ্ছে ছিল আমাকে ডাক্তার বানাবে। আর আমার ইচ্ছে ছিল সাংবাদিক হওয়ার। সিদ্ধান্ত নিলাম ভারত যাব। ব্যবসা করব। পাসপোর্ট বানালাম পেশা লিখলাম সাংবাদিকতা। আমার মধ্যে তখন চরম অস্থিরতা। কিছু একটা করা দরকার। এভাবে আর ভাললাগে না।

ভারতের ভিসা লাগালাম সদরঘাট শংকর বোর্ডিং থেকে। ফি দিলাম একশ টাকা। পাসপোর্ট হাতে পেয়ে একবার পেশার দিকে তাকাই আবার ভিসার দিকে তাকাই! ভাল লাগে!

গুলিস্তান থেকে বাসে বেনাপোল। দশ টাকা না দিলে ডিপার্চার সীল মারবে না তবুও দিলাম না। ঘন্টা পর ছেড়ে দিল! নোম্যানস ল্যান্ড পাড় হয়ে ভারতের মাটিতে পা রাখলাম। জীবনের প্রথম বিদেশের মাটিতে পা, অন্য রকম অনুভূতি। আরও কয়েক পা হেঁটে ইমিগ্রেশন রুমের সামনে লাইনে দাঁড়ালাম। এক লোক এসে সবার পাসপোর্ট নিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর ফিরে এল একটা পাসপোর্ট নিয়ে। আমার হাতে দিয়ে বলল, “স্যার, এখান দিয়ে যান!Ó এক পা দু'পা করে এগুচ্ছি। পেছনে তাকিয়ে দেখি সবার কাছ থেকে দশ টাকা করে নিচ্ছে! ভাবলাম সাংবাদিক আমাকে হতেই হবে!

দেশে ফিরে লেখালেখিতে আরও মনোযোগী হলাম। বই পড়ি পত্রিকা পড়ি আর লিখি! ঘর থেকে বের হই না যতক্ষণ না প্রকৃতি আমাকে ডাক দেয়! আমার উপর রাগও সবার বাড়তে লাগল!

অসুখের আগে কখনও খেয়ে কখনও বা না খেয়েই স্কুলে গেছি। সময় মত খাবার না জুটলেও দপ্তরী মোহাম্মদ আলীর বিখ্যাত ঘন্টা সময় মতই বাজত। কিন্ত এখন কোন ঘন্টা আমাকে তাড়া করে না। খাবারের জন্যে অপেক্ষা করার মত প্রচুর সময় আমার আছে। তবুও আমার অপেক্ষা সয় না। সকাল নয়টার মধ্যে নাস্তা, অপরাহ্ন দুইটার মধ্যে দুপুরের খাবার না পেলে মেজাজ বিগড়ে যায়। সাড়ে দশটা এগারোটার আগে মুখে নাস্তা জুটে না। নাস্তা বলতে গরমভাত আর বাসী তরকারী। ঘুম থেকে উঠে পাড়াময় একপাক না দিলে আমার মায়ের ভাললাগে না। তারপর ভাত শিকেয় উঠে। দুপুর একটায় বা দেড়টায় যখন মানুষ খেতে বসে আমার মা তখন রান্না ঘরে ঢুকেন। তিনটে বা চারটের আগে দুপুরের খাবার কপালে জুটে না।আবার ঠিক সন্ধ্যা না হতেই রাতের খাবার খেতে হয়। এটা অভাবের কারণে নয় স্বভাবের কারণে। বাবা

আবুধাবীতে চাক্‌রী করেন। সংসারের জন্য টাকাও পাঠান। হয়ত তা যথেষ্ট নয় আমাদের বড় সংসারের জন্য। বড় সংসার বলতে আমরা ছয় ভাই এবং মা সঙ্গে বড় বোন এবং ওর চার পাঁচটি ছেলে মেয়ে।

আমার প্রবল আপত্তি সত্বেও প্রতিবেশী এক ঘর নাই বাড়ি নাই ছেলের সঙ্গে বাবা তাঁর একমাত্র মেয়েকে বিয়ে দিলেন। এ ঘটনা বাবা বিদেশ যাওয়ার কয়েক বছর আগের। জেনারেল জিয়া তখন বাংলাদেশ নামক ঘোড়ার পিঠে সওয়ার। বাবা বললেন, " জিয়াউর রহমানের সাথে আমার মেয়ের বিয়া দিলাম।" সেই জিয়াউর রহমানও বিয়ের পরে আমাদের পরিবারের একজন সদস্য হয়ে গেলেন। কখনও কাজ করেন কখনও করেন না। শহরে গেলে গ্রামে ফেরেন না। গ্রামে ফিরলে শহরে যেতে চান না। কাজ করে পয়সা যা পান নিজের জামা কাপড় এবং ফাইফ ফাইফ বিড়ির পেছনেই তা খরচ হয়ে যায়! বাড়িতে স্ত্রী সন্তানের জন্যে এক পয়সাও তার হাতে থাকে না। বেচারার আর কি দোষ! দোষ তো সব আমার বাবার। দেখে শুণে এমন একটা ছেলের সাথে মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন। তার মাশুল তো দিতেই হবে।বাবা সেই মাশুল দিচ্ছেন । বাবাকে সেই ভুলের মাশুল দিতে হয়েছে বিশ বছর। তাঁর বড় নাতনীকে বিয়ে দেওয়ার আগ পর্যন্ত।

একদিন মাকে বললাম, রান্না তো ঠিকই হয় সময় মত হলে দোষ কি। মা কোন জবাব দিলেন না। বুঝতে অসুবিধা হল না যে মা রেগে গেছেন। কিছুদিন পর একদিন মাকে আবার বললাম, রোজ রোজ তিনবেলা ভাত ভাললাগে না । সকালে অন্য কিছু করা যায় না? রুটি বা..? আমার মুখের কথা শেষ না হতেই মা বললেন, "রুটি বানাইতে কষ্ট লাগে পারুম না, বানাইয়া খাওগা।" আবার সাহস করে বললাম, তা না হলে একদিন খিঁচুড়ী, পরের দিন পিঁয়াজ কাচা মরিচ দিয়ে ভাঙ্গা চাউলের ভাত। তারপর দিন.. । মা প্রচন্ড রেগে বললেন, "খাওয়া নিয়া কেউ কোন কতা কয় না, তোমার এত অসুবিদা অয় ক্যা?" সত্যিই তো ! কারও কোন টু শব্দটি নেই। খাবার ভাল হোক বা না হোক মুখ বুজে সবাই খেয়ে উঠে। আর আমি কিনা তিন বেলাই বিরক্ত করি!

আমার ইমিডিয়েট ছোট ভাই চুন্নু তখন বাড়ির হর্তাকর্তা। বাজার করা বা ছোট ভাইদের দিয়ে করানো, টেলিফোন বিল, বিদ্যুত বিল দেওয়া ইত্যাদি; বাড়ির সমস্ত কাজ ও ই করে বা করায়! বাড়িতে মা, বড় বোন এবং প্রবাসী বাবার অনুগত সন্তান হিসেবে ততদিনে ও আদর্শ সন্তানের স্বীকৃতি পেয়ে গেছে। ছোট ভাইয়েরা এবং বোনের ছেলে মেয়েরাও ওকে যথেষ্ট সম্মান করে ভালবাসে। ওর কথা সবাইগুরুত্ব দেয়। আমি চোতরাপাতা হয়ে ওদের

মাঝে বেঁচে আছি। আমার গুরুত্বহীণ কথায় ওরা বিরক্ত হয় পাছায় চুলকানি অনুভব করে। তবুও কখনও সখনও না বলে থাকতে পারি না। আমার তিন নম্বর ভাই কবীর বাবার সঙ্গে আবুধাবীতে। বাড়িতে কেউই আমার সঙ্গে কোন কথা বলে না। চার নম্বর ভাইয়ের এক বন্ধুকে একদিন বললাম, নাঈদ তো লেখাপড়া ছেড়ে দিল, তোমাদের সাথে ঘুরে ফিরেই সময় নষ্ট করছে তো ওকে বল আমার বুক সেল্ফ থেকে বই নিয়ে যেন পড়ে তাতে ভবিষ্যতে কাজে লাগবে। আমি প্রতিদিন খেয়াল করছি নাঈদ বুকসেল্ফ থেকে কোন বই নেয় কিনা। না, বই নিচ্ছে না। কিছুদিন পর ছোট ভাইয়ের সেই বন্ধুটিকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কি নাঈদকে বইয়ের ব্যাপারটা বলেছিলে? হ্যাঁ বলেছিলাম। ও কি বল্ল? বল্লঃউনি তো জীবনে অনেক বই পড়ছে,কি করছে? শুণে ভীষণ কষ্ট পেলাম সেই সঙ্গে লজ্জাও।

দিন যাচ্ছে শুয়ে বসে এবং বই পড়ে পড়ে। আমার রুম থেকে খুব একটা বের হই না। কখনও বের হলে একা একা হাঁটতে হাঁটতে সকাল হলে মোশরাফ চাচার টং দোকানের বাঁশের বেঞ্চ বিকেল হলে গ্রামের পূর্বদিকে বিলের পাড় আমার ঠিকানা। বিকেল বেলা বিলের পাড় সময় কাটানোর জন্যে চমৎকার জায়গা। বিলের উত্তর পশ্চিম দুই দিকে গ্রাম কিছুদূর দক্ষিণেও কয়েক ঘর বাড়ি আছে। পূর্বদিকটা একেবারে খোলা। চারপাশই সবুজে সবুজ। কিন্ত আমি ছাড়া পড়ন্ত বিকেলে এখানে কেউই আসে না। হয়ত আমার মত দুঃখী কেউ নয় বলে। যুবক বা বৃদ্ধ সকলেই আড্ডা দেয় তিনটেকে সম্রাট শাহ্জাহানের চায়ের দোকানে। চায়ের কাপে রাজনীতির ঢেউ তোলে। সেই ঢেউ ভাসিয়ে নিয়ে যায় প্রতিপক্ষ, গ্রাম বা দেশ।

সন্ধ্যার সাথে সাথে ঘরে ফেরা আমার অভ্যাস। আজও। অন্ধকার হয়ে গেলে ঘরের বাইরে আমার ভাল লাগে না। বাইরের রঙিন বিজলী বাতির চেয়ে ঘরের হ্যারিকেনের আলো আমার বেশী প্রিয়। বাড়ির কেউ পছন্দ করেনা! ছেলে মানুষ এত তারাতারি বাড়িতে কি কাজ! সবার ছোটটা বাড়ি ফেরে সবার দেরীতে। গ্রামের অবস্থা ভাল না। চতুর্দিকে চুরি ডাকাতি হয়। কোথায় কখন ফেঁসে যাবে কে জানে। চোখের সামনে এসব দেখে চুপ থাকা যায় না। মেঝোকে একদিন বললাম, দিনকাল ভাল না রন্জুকে বলিস যেন আরও আগে বাড়ি ফেরে। মেঝো কানে তুলল না।

কয়েক দিন যাবৎ তিনবেলা ই সব্জীর ককটেল খেতে হচ্ছে! তার মধ্যে গুল আলুর পরিমাণ সবচেয়ে বেশী। সবাই মুখ বন্ধ করে খাচ্ছে। আমার মুখে যাচ্ছে না। চুন্নু

কোথায় যেন জেনেছে সব্জী শরীরের জন্য খুব ভাল তাই এই ব্যবস্থা! অনেক পুরুষকে স্ত্রীর সাথে রাগ করে ঘরের জিনিস পত্র ভাঙ্গতে দেখেছি । এখন নিজের উপর রাগ করে আমার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে। টানও দিলাম একবার! ব্যথা লাগে।

বাবার কাছে খবর গেল আমি বাড়াবাড়ি শুরু করে দিয়েছি! কোন কাজ করিনা। কারও কোন কথা শুনিনা। খাবার নিয়েও মায়ের সাথে রাগারাগি করি! বাবা আমাকে শাসিয়ে সতর্ক করে দিলেন! আগে দু চারটা কথা বলতাম এখন তাও বন্ধ করতে হল। কারণ কথা বললেই যদি দোষ হয় এর চেয়ে না বলাই ভাল। মা প্লেটে একবার যে খাবার দেয় তা খেয়েই আমি উঠে যাই। কম হলেও বলিনা বেশী হলেও কিছু বলিনা। মুখে ভাললাগলে সব খেয়ে উঠি না লাগলে যা পারি খেয়ে উঠি। ছয় মাস এভাবে কাটল। আবার আমাকে শাসিয়ে চিঠি লিখলেন বাবা! “মায়ের সাথে কথা বল না! এত বড় সাহস! এখন পর্যন্ত কামাই করা শিখনি, এখনই এই অবস্থা!”

বিমানের টিকিট কাটলাম সিঙ্গাপুর। তখন বাংলাদেশ থেকে সিঙ্গাপুর লোক যায় চাকরী করতে। ভাবলাম গেলে হয়ত চাকরী পেয়ে যাব। গ্রামের মহিলারা বলাবলি করত, “সিঙ্গাপুর থেকে দেশে টাকা পাঠানো যায় না।” মেয়েরা নাকি বাসায় এসে টাকা পয়সা সব নিয়ে যায়। প্রথমে বুঝতে পারিনি কেন মেয়েরা এসে আমার টাকা নিয়ে যাবে! আমার চেয়ে বয়সে কিছু বড় বন্ধুর মত একজন বলল, “সিঙ্গাপুর যাচ্ছেন! মেয়েরা তো এয়ারপোর্ট থেকে আপনাকে নিয়ে যাবে!” বিমানের ভেতর বসে কতকিছু ভাবছি! ভয় আনন্দ! চাঙ্গী এয়ারপোর্ট নামলাম। অনেক মেয়ে মহিলা চোখে পড়ছে। ভাবছি এই বুঝি আমাকে কেউ নিতে আসল! নিতে আসা! আমার দিকে কেউ ফিরেও তাকাল না!

কি সুন্দর দেশ! ছবির মত। মেয়েরা পরীর মত। পরী আছে কি নেই জানিনা।শুনেছি শুধু। কল্পনার মেয়েরা পরীর মতই হয়। যাকে ধরা যায় না ছোঁয়াও যায় না। সেই পরী! ছোট ছোট জামা কাপড় পড়া মেয়ে দেখলে দেখতেই ইচ্ছে করে আমার । সে শিশু হোক অথবা শিশুর মা! হালকা পাতলা লম্বা এবং মার্জিত হলেই ভাললাগে। পৃথিবীটা যে কত সুন্দর শিশু এবং নারী দেখলে আমি তা বুঝতে পারি। আজও!

মেরিনা বে, সন্তোষা, ঝুরং বার্ডস পার্ক, টাইগার পাস, বোট্যানিকাল গার্ডেন, আরও কত জায়গা ঘুরে বেড়ালাম! সিঙ্গাপুর ঝকঝকে তকতকে সাজানো গোছানো ছোট্ট

একটা ড্রইং রুমের মত মনে হয় আমার। সবই আছে যেখানে যা প্রয়োজন সুন্দরের জন্য।

টুরিষ্ট ভিসায় এসেছি তাই চাকরী পেলাম না। চাকরী করতে হলে কন্ট্রাক ভিসায় আসতে হবে। আইনকে ভয় পায় অথবা সম্মান করে চাইনিজ জাতি। দুজন বাঙালীর দেখা পেলাম সঙ্গে চাকরীর খবর! নিঃসন্দেহে দারুণ খবর! একজন বিক্রমপুরের রমজান আলী অন্যজন নোয়াখালীর ইংরেজ আলী। ইংরেজ আলী মানুষের নাম ! আগে শুনিনি কখনও তাই হেসে ফেললাম। লোকটা লজ্জা পেল। দুইশ ডলার দিলে আপনাকে আমরা চাকরীটা দেব। আমি চাকরীরর জন্যে সব দিতে রাজী আছি আর ওরা বলে কিনা মাত্র দুইশ! দুইশ ডলার দিয়ে চাকরী পেলাম। ছয় দিন কাজ করার পর পঞ্চাশ ডলার দিয়ে বিদায় করে দিল! কাজ নেই! পরে জেনেছি এদের গ্রুপ আছে। মানুষকে বোকা বানানো বা ঠকানোই এদের ধান্ধা। কাকে কাকের মাংস খায় না। কোন জীবজন্তুই মনে হয় খায় না কিন্ত বাঙালী বাঙালীর মাংস মজা করে খায়। আমার জানা মতে পাকিস্তানীরা পৃথিবীর সবচেয়ে খারাপ মানুষ। কখনও দেখিনি এমন কি শুনিনি কোন পাকিস্তানী অন্য পাকিস্তানীর সাথে প্রতারণা করেছে।

কোন উপায় নেই। জাপান চিঠি লিখলাম আমার এক ঘনিষ্ট আত্মীয়ের কাছে, আমি সিঙ্গাপুর এসেছি দুই সপ্তাহ আগে। এখানে থাকার উপায় নেই। আপনি বললে টিকিট কেটে চলে আসি। দিন কয়েক পর জবাব এল, “এখানকার অবস্থা ভাল না। তুই দেশে ফিরে যা আমি কয়েক দিনের মধ্যেই দেশে যাচ্ছি। তোকে আমার সাথে নিয়ে আসব।” দেশে ফিরে যেতে হবে। যন্ত্রণার সাগরে। ভাললাগছে না। তবুও যেতে হবে। কিছু কেনাকাটা করলাম । খরচটা যদি কিছু উঠে আসে!

ফিরে এলাম দেশে। লাগেজ না খুলেই কাষ্টমস অফিসার বললেন, “পাঁচ হাজার টাকা দেন, চলে যান!” আরেক বেচারাকে জবাই করার জন্যই এই তাড়াহুড়ো। বলালাম, কাষ্টমস দিতে হবে এমন কোন মাল আমি আনিনি, আপনি লাগেজ খুলে দেখুন। আমার দিকে বিরক্ত হয়ে তাকাল সাদা পোশাক পরিহিত কাষ্টমস অফিসার। আমাকে দাঁড় করিয়ে রেখে আরেক যাত্রীর সাথে কথা বলা শুরু করল। একই ভঙ্গিতে দরদাম! ভেড়া মহিষ সব একদাম! সব যাত্রী চলে গেছে। আমি একা দাঁড়িয়ে আছি। কাষ্টমস অফিসার নাছোড় বান্দা। বললেন, পাঁচশ টাকা দিলে ছেড়ে দেব। “বলালাম, এক পয়সাও দেব না! আপনাকে আমার লাগেজ খুলে চেক করতে হবে তারপর কোন মালের জন্য কত টাকা দিতে হবে লিখে দেবেন

আমি ব্যাংকে জমা দেব। আমাকে এমনভাবে দেখছে যেন এ রকম মানুষ জীবনে আর দেখেনি! সবাই তাকিয়ে আছে আমার দিকে। অনেক ঘাঁটাঘাঁটি করে কি যেন একটা পেল! গায়ের জোরে কাষ্টমসের আঁঠা লাগিয়ে দিল দুই শ পঞ্চাশ টাকা। ব্যাংকে জমা দিয়ে বেড়িয়ে এলাম। কাষ্টমস অফিসারদের মন কাল হবে ভেবেই হয়ত কর্তৃপক্ষ তাদের জন্য সাদা পোষাক নির্ধারণ করেছে।

টার্মিনাল থেকে বের হতেই ভিখিরিদের খপ্পরে পড়লাম। "স্যার একটা টাকা দ্যান।" আরেক জনে বলছে, অনেকেই বলছে কোরাস করে, "স্যার একটা টাকা দ্যান"। একজনকে দিলাম এক টাকা। "এইটা বদলাইয়া বিদেশী এক টাকা দ্যান!" জোর করে আমার কাছ থেকে কয়েক জনে ভিক্ষা নিল ওদের পছন্দ মত!

টেক্সির কাছে যেতে হল না, ড্রাইভাররাই আমার কাছে এসে টানাটানি শুরু করে দিল। কেউ লাগেজ কেউ আমাকে। দরদাম করার সুযোগ পেলাম না। যে গাড়িতে আমার লাগেজ উঠেছে সেই গাড়িতেই উঠে বসলাম। "স্যার কোথায় যাবেন?" নারায়ণগঞ্জ। গাড়ি চলছে। ধুলাবালি, জ্যাম, ঘুষের শহর, পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ড্রেন ঢাকা শহর পেড়িয়ে গাড়ি এখন বিশ্ব রোডে। বিশ্বের কোন রোডের সাথে এ রোডের কোনই যোগাযোগ বা নূন্যতম মিলও নেই তবুও এর নাম বিশ্ব রোড! আমাদের গ্রামের এক লোক নাম বাদশা মিয়া।জন্মের পর থেকেই আমি দেখে আসছি বিল ঝিল,ডোবা নালা থেকে মাছ ধরে বাজারে বিক্রী করে তার সংসার চলে। হত দরিদ্র অবস্থা তার ইহজীবনে কাটেনি। খোঁজ নিয়ে জেনেছি তার পূর্ব পুরুষদের মধ্যেও কেউ রাজা বাদশা ছিল না।

গাড়ি চাষাঢ়া পৌঁছতে ড্রাইভার কে বললাম, ডানে মোড়। ডালডা গেট চেন? পঞ্চবটি? চিনি। গাড়ী এসে ভিড়ল এই এলাকার সবচেয়ে মনোরম বাড়ি আঁচল এর সামনে। ড্রাইভারকে বললাম, ভাড়া যা তাই বলবে বেশী চাইলে ভাড়া দেব না। কম চাইলে তুমি ঠকবে। ভাড়া দিলাম ওর কথা মতই তবুও যাচ্ছে না! কি ব্যাপার? "স্যার, বখশিশ?" বাংলাদেশের সব পেশার মানুষই ভিক্ষুক হয়ে যাচ্ছে নাকি!

এই বাড়িটির সাথে আমার অনেক স্মৃতি আছে। টক ঝাল মিষ্টি স্মৃতি। এটা আমার ফুপি বাড়ি। বাবার একমাত্র ছোট বোন। আমরা ভাই বোন সবাই আমাদের ফুপিকে ডাকি ফুফুজান। ফুপি থেকে ফুফুজান কিভাবে হয়েছে আমরা কেউ তা জানিনা! আমাদের অনেক সাহায্য করেছেন ফুপা। ডুবন্ত একটা সংসারকে তিনি টেনে তুলেছেন। নিশ্চয়ই নেপথ্যে ফুফুজানের ভূমিকা ছিল। আমি অনেক দিন এ বাড়িতে ছিলাম। ফুফাজান ফুফুজান দুজনেই

আমাকে ভালবাসতেন। লোক মুখে শুনেছি বাবার সাথে নাকি ফুফুজানের কথা হয়েছে। তাঁর মেয়ের সাথে আমার বিয়ে পাকা। গ্রামের অনেকেই আমাকে বলত, "তুই তো তোর ফুপাত বোনকে বিয়ে করবি। তাই তোর ফুপা ফুপি তোরে এত আদর করে।" অথচ আমি ওকে একদম পছন্দ করতাম না। ও করত না আমাকে।। কারণ ও ছিল ভীষণ রাগী। ওর বড় ছয় ভাই আঁতুর ঘরেই মারা গেছে। মুরুব্বীরা বলত এ কারণেই রাগী হয়েছে। পরে ঠিক হয়ে যাবে। ফুপা ফুপির সাথে আমার বাবাও ওকে খুব আদর করতেন।

আমার লেখাপড়া টাইফয়েডের সাথে ভেসে গেছে। টুটু করে ঘুরে বেড়াই। পেছনে কেউ কেউ বলাবলি করে, "টুটু কোম্পানীর ম্যানেজার।" সাধারণ একটা চাকরী পাওয়ার যোগ্যতা আমার নেই আর ওরা বলে কিনা ম্যানেজার! বলবিই যখন তাহলে টাটা কোম্পানির ম্যানেজার বলছিস না কেন!

তিন দিন পর বাড়ি ফিরলাম। আমার চির পরিচিত নরকে। সবাই আড় চোখে তাকায়। আরও টাকা খরচ করে এল! সময় দ্রুত চলে যাচ্ছে। দিন মাস বছর। আমি শুধু থেমে আছি নিভৃত পল্লীর একটি বাড়িতে অনেকের চোখের বালি গলার কাঁটা হয়ে।

বোন বোনের ছেলে মেয়েরা আমার উপর অসন্তুষ্ট। কারণ ওদের এ বাড়িতে থাকা আমি পছন্দ করিনা। অন্য সবাই করে। চার পাঁচজন ছেলে মেয়ে বোন এবং বোনের জামাই। পর্যাপ্ত জায়গা নেই। ঘিঞ্জী নোংরা বাড়ি ঘরের অবস্থা। প্রতিবেশী এক চাচাকে একদিন বলছি, আমার বোনকে একটু বুঝাইয়া বইলেন ও যেন ওর জামাই বাড়িতেই থাকে। কাঁধে বুঝা চাপলে ওর জামাই হয়ত ভাল হয়ে যাবে। আড়াল থেকে বোন আঁড়ি পেতে শুণেছে সেসব কথা। চেঁচামেচি শুরু করে দিল, "এ বাড়িতে থাকি তোর কি? তোরটা খাই না আমার বাপেরটা খাই?"ওকে কেউই থামানোর চেষ্টা করছে না। ছোট ভাই রন্জু বোনের সাথে যোগ দিল। লাঠি খুঁজছে আমাকে মারবে! দু' একজনে থামানোর চেষ্টা করছে রন্জুকে। মা অন্যসব ভাই প্রতিবেশীরা সব জড়ো হয়ে উপভোগ করতে লাগল।

চৈত্র মাসের ভরদুপুর। খাঁ খাঁ রোদ। ঘরের বাইরে তাকানো যায় না। রোদের তেজ চোখে এসে লাগে। আমার পঞ্চম ভাই তারিফ ওর এক বন্ধুকে নিয়ে ডিপ টিউবওয়েলের জলে স্নান করছে। একজনে হাতল ধরে চাপ দিচ্ছে অন্যজন মাথা পেতে রেখেছে কলের মুখে। ঘরে বাজছে সিনেমার গান। "বন্ধু তিন দিন তোর বাড়িত গেলাম দেখা পাইলাম না!" ফুল ভলিউমে। আওয়াজ সহ্য করতে না

পেরে একটু কমিয়ে দিলাম। খেঁকিয়ে উঠল তারিফ, “কে কমাইল রে?” সবার ছোট জবাব দিল, কে আবার! বড়ডা।” Òবাড়ায়া দিবার ক।” তারিফ কলের পাড় থেকে চেঁচিয়ে বলল। আমি কাছাকাছি গিয়ে বললাম, গোসল করতেছ এখন গান শুণা কি দরকার। গোসল শেষ করে ঘরে গিয়ে শুন। Òআমার ইচ্ছা আমি এখন শুনুম। তর কি?” এক কথায় দুই কথায় আমার সাথে তর্ক জুড়ে দিল তারিফ। বাড়ির সবাই তাকিয়ে দেখছে! দু একজন বাইরে থেকেও এসেছে। মাথায় রক্ত চড়ে গেল। আঁছাড় দিয়ে বাবার পাঠানো চমৎকার একটা টেপরেকর্ডার ভেঙ্গে ফেললাম!

আরেক দিন। আঙ্গুর গাছের জন্য মাচা তৈরী করছি। ওর পরিচিত এক মেয়ে এসে আমাকে সালাম দিল। তারিফকে বলল, Òতোমার ভাই তো খুব ভাল। বাড়ির কাজ করছে।” আমার সামনেই মেয়েটিকে তারিফ বলল, “কোন কাম করে না, নিজে গাছ লাগাইছে দেইখ্যা মাচা বানাইবার লাগছে।” মেয়েটাকে দেখে মনে হল কিছুক্ষণ আগে আমাকে সালাম দেওয়ার জন্য ও লজ্জিত। এমন একটা লোককে সালাম দিলাম! যাকে তার আপন ভাইয়েরা মানুষ মনে করে না।”
বাবা চিঠি দিলেন মায়ের কাছে, “চুন্নুর নামে একাউন্ট খোলে নাম্বার পাঠিয়ে দাও । এখন থেকে বাড়ি খরচের টাকা চুন্নুর নামেই পাঠামু।” বাড়িতে আমি একেবারেই কোণঠাসা হয়ে পড়লাম। ঘরের ভেতরও থাকা কঠিন হয়ে পড়ল! নানা রকম কথা শুণতে হয়। আমাকে শুনানোর জন্যেই বলে। বের হলাম ঘর থেকে। রাত ছাড়া এখন আর ঘরে থাকি না।

সঙ্গী জুটল পাশের গ্রামের ক্বারী বাড়ির ক্বোরআনে হাফেজ মোসাদ্দাস মৃদুল ওর সহপাঠি আমার গ্রামের মুন্সী বাড়ির ফিরোজ রহমান। দুজনেই মাদ্রাসার ছাত্র! দুজনেই হাফেজ! আমি ঈশ্বরে অবিশ্বাসী! প্রতিটি বিকেল আসে দুই মেরুর আমাদের তিনজনকে একত্রিত করতে। ইছামতির পাড়ে বসে আমরা কত রকমের গল্প করি! তবে নারী এবং ধর্মই প্রাধান্য পায় মোসাদ্দাস মৃদুল ঠিক আমার মত নাস্তিক! লম্বা জামা পড়ে লোক চক্ষুর আড়াল করে রাখে! আরও বলে, “আল্লাহ আবার কে! মানুষই স্রষ্টা, মানুষই সবার উপরে।” মাঝে মাঝে মৃদুলের পূর্ব পুরুষ ক্বারীসাব কি বলতেন সেসব থেকে উদ্বৃতি দেয় মৃদুল, “আসলে কি জানেন, সত্যটা মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত।” চমৎকার কথা! আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকি মৃদুলের দিকে। ফিরোজ ঘোর আপত্তি তোলে। দুই সহপাঠির বিপরীত চিন্তা আমাকে ভাবায়। ফিরোজ যুক্তি দিতে জানে না। হৈ চৈ করে আক্রমণাত্বক ভঙ্গিতে মৃদুলকে থামানোর চেষ্টা

করে। ইছামতির ঘোলা জলের স্রোতের সাথে ভেসে যায় আমাদের সব কথা।

পরের দিন আবার দেখা হয়। গ্রামের বড় পথ ছোট পথ ধরে যখন হাঁটি পরিচিত জনেরা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে আমাদের দিকে! দুজনের মাথায় ইসলামি টুপি, গায়ে সাদা লম্বা পাঞ্জাবি পড়নে লুঙ্গি। আমার লুঙ্গির উপর সার্ট বা টি-সার্ট মাথা উন্মুক্ত! নামাজের সময় ওরা মসজিদে যায় আর আমি বাইরে বসে ওদের জন্যে অপেক্ষা করি! ভাবি, এসব করে কি পাবে ওরা! কেউ কি পেয়েছে কিছু! কোন প্রমাণ আছে! ওরা ফিরে আসে। তিনজনে হাঁটতে থাকি ফসলি জমির আল ধরে। ধান পাকতে শুরু করেছে। কিছু অংশ সোনালী কিছু অংশ সবুজ। আমি দাঁড়িয়ে পড়ি। ধানের শীষের দিকে তাকিয়ে আছি। কিছু একটা বুঝার চেষ্টা করছি। বুঝতে পারছি না। কাছে গিয়ে ধানের শীষ ধরে বসে আছি। সবুজ থেকে কিভাবে সোনালী হয়! কেন হয়! মনে পরে ডারউইনের বিবর্তনবাদের কথা। সব কিছু পরিস্কার হয়ে যায়। আজকাল অনেক কিছুই মনে থাকে না। মৃদুল ফিরোজ অনেক দূর চলে গেছে! অনেক্ষণ আমার সারা না পেয়ে পেছনে ফিরে দেখে আমি বসে আছি! অনেক পেছনে! মৃদুল চেঁচিয়ে বলছে, “কি হয়েছে? আসছেন না কেন?”

সকাল নয়টা। ফিরোজ রহমান এবং আমি হাঁটছি। খবর পেলাম পাশের বাড়ির মাতবরের এক মেয়ে দূর এক জেলা শহর থেকে এক শিশু বাচ্চা অপহরণ করে নিয়ে এসেছে কয়দিন আগে। গতকাল সেই শিশুটিকে পাগলা পূর্বপাড়া গ্রামে এক নিঃসন্তান দম্পতির কাছে বিক্রি করে দিয়েছে। ফিরোজকে রাজী করিয়ে দুইজনে চলে গেলাম পাগলা পূর্বপাড়া গ্রামে । খোঁজে বের করলাম বাড়িটি। শিশুটি কেবল হাঁটতে শিখেছে। ভুলে গেলাম আমার মা যে আমাকে দেখতে পারে না। এই শিশুটির মা নিশ্চয়ই সন্তানের জন্য প্রতিদিন কান্নাকাটি করছে। তাঁর বুকে কিযে কষ্ট! সন্তান হারানোর যন্ত্রণা। আমি নরসিংদি যাচ্ছি, এই শিশুটির বাবা মাকে খোঁজে বের করতে, আপনি যাবেন? ফিরোজ যেতে রাজী হল না। আমি একাই চলে গেলাম ।

অনেক খোঁজেও বাড়ির সন্ধান পেলাম না। বিকেল প্রায় চারটা । আজ কিছুই খাওয়া হয়নি। না সকালে না দুপুরে। ক্ষুধার্ত ক্লান্ত হতাশ আমি বাড়ি ফেরার কথা ভাবছি। স্থানীয় একজন বলল, “থানায় গিয়ে রিপোর্ট করেন।” থানা পুলিশ কোর্ট কাচারি আমি জমের মতই ভয় পাই! এসব ব্যাপারে শুণে শুণে যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে মনে হল, মুরগী হয়ে শিয়ালের সামনে গিয়ে বলা, আমাকে খান! ফিরে এলাম বাড়িতে। রাত আটটায়।

অনেক দিন পেরিয়ে গেছে। পাগলা পূর্বপাড়া গ্রামের সেই শিশুটি এখন কত বড় হয়েছে? কেমন আছে ও? যদি বেঁচে থাকি একদিন ওকে দেখতে যাব। রাস্তার ধারে, চাঁনতারা খঁচিত মসজিদের পাশে কাঠটিনের তৈরী সেই বাড়িটি। পরিস্কার মনে আছে!

আমার ঘনিষ্ট আত্মীয় আবুল জাপান থেকে ফিরে এসেছে। দেখা করলাম। কিছু বলল না! ভাবলাম সময় হলে ঠিকই আমাকে জানাবে। কিন্ত আমাকে না জানিয়ে দুই মাস পরে আবুল তার এক চরের বন্ধুকে নিয়ে উড়ে গেল জাপান।ভাবলাম এরপর হয়তো আমার পালা। আসায় বসে আছি। আবুলের ছোট ভাই হলুদ চলে যাচ্ছে জাপান আগামী সোমবার! আমি তাকিয়ে দেখছি। সিঙ্গাপুর ঘুরে এসেছি। আমি একাই যেতে পারতাম। টাকা পয়সা নষ্ট হওয়ার ভয়ে আবার ঝুঁকি নিয়ে সবার দৃষ্টি ও ব্যবহার আরও তীক্ষ্ম করতে চাই না। আবুলের কাছে শুধু গ্রীণ সিগনাল আসা করে ছিলাম। পেলাম না। পরে জেনেছি আবুল আদম ব্যবসা করছে! জাফর খান নামে এক ব্যক্তির কাছে শুণেছি কিভাবে তার কাছ থেকে টাকা নিয়েছে জাপানের কথা বলে! কিভাবে আবার ফেরৎ দিয়েছে তাও জেনেছি! নিজের চোখে দেখেছি আবুল তার মামাত ভাইকে অষ্ট্রেলিয়া পাঠিয়ে মামার কাছ থেকে অন্যদের চেয়ে অনেক বেশী টাকা আদায় করেছে! যে মামা কিনা তার সন্তানদের চেয়েও আবুলকে বেশী ভালবাসতেন!

বাবা ফিতায় কথা রেকর্ড করে পাঠিয়েছেন। সবাই শুনেছে। আমি জানিনা। কেউ বলেনি। তাই শুণা হয়নি আমার। আমি আমার রুমে আছি বুঝতে পেরে কেউ পাশের ঘর থেকে বাবার কথা চালিয়ে দিল। ফুল ভলিউমে! আশপাশের দশ বাড়ির লোকজন শুনছে! বাবা বলছেন, "সারাদিন কোথায় থাক? বাজে ছেলেদের সাথে ঘুরে বেড়াও বুঝি! ভাল হয়ে যাও বলছি। কবিতা লেখ!? আমি যাকে ভালবাসি...! এসব ছেড়ে দাও, পয়সা কামাও।" আরও কত কি! আমাকে শাসাচ্ছে, ধমক দিচ্ছে । শুনে মিটমিট করে হাসছে প্রতিবেশীরা! কি যেন ফিসফিস করে বলাবলি করছে কেউ কেউ। সবাই মজা পাচ্ছে! জীবনের সেরা মজা! একাকী ঘরে বসে শুনতেও আমার লজ্জা লাগছে। বের হয়ে গেলাম ঘর থেকে। রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ালাম। সেখান থেকেও শুনা যাচ্ছে! আরও দূরে সরে গেলাম। না এখন আর শুনা যাচ্ছে না। হাঁটছি আর ভাবছি, বিজ্ঞানের অবদান! চিঠিতে এসব কথা লিখলে এতটা জীবন্ত এবং কঠিন মনে হত না।

খলিল দেওয়ান।আমার দুঃসময়ের বন্ধু। একমাত্র এর কাছে এসেই আমি শান্তি পাই। অসম্ভব ভাল মানুষ। এ

সময়ে এ জগতে এ রকম ভালমানুষ পাওয়া কঠিন। মাঝে মাঝে মনে হয় অন্য গ্রহ হতে পথ ভুলে তিনি এই নোংরা গ্রহে এসে পড়েছেন। প্রতিদিন সকালে খলিল ভাইয়ের সাথে দেখা করি। ভাবী প্রায়ই এটা ওটা খেতে দেন। কখনও বা খলিল ভাই নিজেই হাতে করে খাবার নিয়ে আমার কাছে আসেন। বসে বসে জীবনের গল্প বলি। দুঃখের গল্প। আমার কোন সুখের গল্প নেই। বাড়িতে সময় থেমে থাকে। দেওয়ান বাড়িতে এলে সময় দৌঁড়ে চলে যায়।

বাবা বাড়ি এলেন চার বৎসর পর। আমি ভয়ে একেবারে চুপসে গেছি।এত রাগী জানিনা আমাকে কি করবে। বিদেশ থেকে এতদিন পর এসেছেন তাই হয়ত তিন চারদিন কিছু বললেন না। পাঁচদিনের দিন অনেক আত্নীয় এসেছে বাবার সাথে দেখা করতে। বাবা তাদের সামনেই শুরু করে দিলেন আমার সাথে রাগারাগি। যতটা না আমার লেখাপড়ার জন্যে তার চেয়ে বেশী ভারত সিঙ্গাপুর গিয়ে পয়সা নষ্ট করার জন্যে! রোজা রাখিনা, নামাজ পড়ি না এমন কি আল্লাহকে বিশ্বাস করিনা! আল্লাহর বিরুদ্ধে কথা বলি! এত বড় সাহস!! এসবই চেঁচিয়ে শুনিয়ে দিলেন যারা এতদিন জানত না তাদের।

বাবার ছুটি কাটছে আমার দিন কাটছে না। সারাক্ষণ ভয়ে ভয়ে থাকি। আবার না জানি কখন রেগে যান বাবা! বাবার পেছনে পেছনে ঘুরি। যখন যা করতে বলেন তাই করি। আমার নাম অপূর্ব, সবাই অপু বলেই ডাকে। একদিন আমার গ্রামবাসী এক চাচা ঢাকা থেকে সরাসরি আমাদের বাড়িতে এলেন। বাবাকে বললেন, অপুকে আমার সাথে ঢাকায় যেতে হবে। পরশু দিন ওর ফ্লাইট! কোন দেশে, কি কাজ, বেতন কত কিছুই জানা হল না। ঢাকা পৌঁছে মেডিকেল চেকআপ করালাম। পরের দিন বিমানে চড়ে বসলাম। কোথায় যাচ্ছি জানিনা!

বিমান এসে ল্যান্ড করল সানা। হাজার হাজার বছরের পুরোনো একটা শহরে। বাসে করে যাচ্ছি। কোথায় এলাম! মাঝে মাঝে পুরোনো দুই চারটা বাড়িঘর চোখে পড়ে। আর সব বালু আর বালু! কোথায় যাচ্ছি! কোম্পানি আমাদের এনেছে অথচ থাকার জায়গা নেই! খাওয়ার ব্যবস্থা নেই! বাবাকে জানালাম না। শুনলে চিন্তা করবেন ভেবে। চিঠি লিখলাম, আমি ভাল আছি। কোন চিন্তা করবেন না। তবে টাকা পয়সা কিছু বাকি থাকলে দিয়েন না। দুই মাস কষ্ট করার পর কোন রকম থাকা ও খাওয়ার একটা ব্যবস্থা হল। কাজ! করি। বেতন পাই না। অনেকে দেশে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। আমি ভাবছি ওরা দেশে যাবে আর আমি অন্য কোথাও কাজ খোঁজে নেব। নরকে আর ফিরতে চাই না। তাছাড়া বাবার অনেক টাকা নষ্ট করেছি। এর মধ্যে বাবা বাকি টাকা আদম বেপারী গ্রামবাসী

চাচাকে দিয়ে দিয়েছেন। একদিন ওরা ফিরে গেল দেশে। আমি পড়ে রইলাম ওল্ড মিউজিয়াম সিটি খ্যাত সানা, ইয়েমেনের রাজধানীতে। বাবা সব শুনে আমাকে লিখলেন, "এখনও মিথ্যা কথা বলা ছাড় নাই।" কষ্টে বুকটা ফেটে যেতে চায় আমার। কার জন্য কি করলাম!

বাদশা আবরাহা'র তৈরী কাবা' ঘর দেখতে গেলাম একদিন। ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে নয় । ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শনের ইচ্ছে নিয়ে। জায়গাটির নাম "বাব আল ইয়েমেন" অর্থাৎ ইয়েমেনের দরজা। বিশাল এক গেট দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলাম। সুউচ্চ মাটির প্রাচীরে ঘেরা শহরের ভেতর আরেক শহর। ঘিঞ্জী এলাকা। হাজার বছরের পুরোনো বহুতল মাটির দালানের পাশ দিয়ে সরু গলি। এঁকেবেঁকে এসে ঠেকেছে আবরাহা'র মসজিদে। হালকা কাজ করা বৃত্তাকার একটি ঘর। মাঝখানে খোলা আকাশের নীচে মক্কার কাবা'র আদলে কাল পাথরের চৌকোনো ছোট্ট আর একটি ঘর। একটা ছোট কামরার মত। লোহার একপাল্লা দরজা। সারাক্ষণ তালা বন্ধ থাকে। নামাজ পড়তে লোকজন ভেতরে ঢুকছে। বেরুতে বেরুতে মনে পড়ল, কোরআনে বর্ণিত আছে, এটা তৈরীর পর মক্কার কাবা ভাঙ্গতে গিয়ে বাদশা আবরাহা আল্লাহ প্রেরীত ছোট ছোট আবাবীল পাখির মুখ থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর বর্ষণে সদলবলে হাতি ঘোড়াসহ মীনা নামক স্থানে মারা গেছে! সেই সৌদি আরব সাদ্দামের আক্রমণের ভয়ে এমেরিকান সেনাবাহিনীর কাছে সাহায্যের জন্য হাত পেতেছিল! আল্লাহর আবাবীল পাখিরা কি বেঁচে নেই! নাকি এমেরিকান সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছে?

দুই বৎসর পেড়িয়ে গেছে। মায়ের চিঠি পেলাম। লিখেছে, "কবীরকে তোমার ওখানে নিয়া যাও। ওর চিন্তায় রাতে আমার ঘুম হয় না । কে জানি কখন ওরে মাইরা ফালাইবো ঠিক নাই। আমার ভয় লাগে।" অনেক কষ্ট হয়েছে আমার তবুও কবীরকে নিয়ে এলাম । আমার পরিচিত সবার সাথে ওর পরিচয় হল। ভাবলাম এখন আমি যেতে পারি। কিন্ত যাব কিভাবে! পাসপোর্ট নেই।

বিভিন্ন ভাবে হাজার কিলোমিটার পাড়ি দিয়ে সৌদি আরবের জিজান পৌঁছলাম। সেখান থেকে মক্কা নগরী। গ্রামবাসী এক চাচার দেখা পেলাম। চাচার বাসায় থাকি খাই। বিকেলে প্রায়ই কাবা চত্বরে যাই। সব ঘুরে ফিরে দেখি। বুঝার চেষ্টা করি মুসলমানরা এটার জন্য পাগল কেন! এখানে কি আছে। আবরাহা'র কাবা'র চেয়ে ইব্রাহিমের কাবা নিঃসন্দেহে সুন্দর। কিন্ত প্রশ্ন জাগে, শুরু থেকেই কি এ রকম ছিল? আরবী হরফ খচিত কাল কাপড়ে ঢাকা, আরবী ক্যালিওগ্রাফী স্বর্ণের দরজা। কাবা'র ঠিক নীচে আন্ডার গ্রাউন্ডে জমজম কূপ। সেখানে

নেমেছে বড় দুটি পাইপ। কেউ কেউ বলে, এই পাইপ দিয়েই কূপে পানি ঢালা হয়। পানি যখন উঠে আসে তখন সেটি হয়ে যায় জমজমের পানি! মনে পড়ে, ইব্রাহিম নামের এক ব্যক্তি একদিনের শিশু বাচ্চাসহ তার স্ত্রীকে বাড়ি থেকে বেড় করে দিয়েছিল। এরপরে ইসলাম মানবতার কথা বলে কোন মুখে! যা হোক, শিশু বাচ্চা তৃষ্ণায় যখন ছটফট করছিল তার মা তখন সাবা মারওয়া নামক দুটি পাহাড়ে দৌঁড়াচ্ছিলেন পানির জন্য। একবার সাবা পাহাড়ের দিকে আবার মারওয়া পাহাড়ের দিকে। তখনই শিশুর পায়ের কাছে এই গায়েবী কূপ সৃষ্টি হয়! হাঁটতে হাঁটতে চলে এসেছি সাবা মারওয়া পাহাড়ের মাঝখানে। এখন এখানে পানির কোন সমস্যা নেই তবুও মানুষ দৌঁড়াচ্ছে কিসের জন্যে! প্রয়োজনে একজন মানুষ একদিন দৌঁড়েছিল। সেই কারণে এখন অপ্রয়োজনেও লাখ লাখ মানুষকে দৌঁড়ানো সুভবুদ্ধির পরিচয় বহন করে না।

জেদ্দা এলাম। কাজও পেলাম। বিল্ডিং ডেকোরেশনের কাজ। প্লাষ্টার অব প্যারিস দিয়ে তৈরী বিভিন্ন ধরনের নক্সা। কাষ্টমারদের চাহিদা অনুযায়ী তাদের বাড়িতে বা অফিসে গিয়ে ফিটিং করা। দৃষ্টি নন্দন কাজ। প্রচুর পয়সা। সবই কোম্পানীর পকেটে যায়। কর্মচারীদের বেতন দেয় না কিন্ত গালি গালাজ দিতে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করে না। নোংরা সব গালি! লিখার মত নয়! এশিয়া এবং আফ্রিকা মহাদেশের বেশ কয়েকটি দেশ আমি ঘুরেছি। এরাবিয়ানদের মত খারাপ মানুষ আমার চোখে পড়েনি। নবীর দেশের মানুষ বলে কথা! এদের সমালোচনা করা নাকি পাপ! সত্য কথাও পাপ! ইসলামে পক্ষপাত সব জায়গায়। ইরাকেও নাকি এ রকম আছে! একজন পীরের জন্য ওই দেশে মাটির নীচে বসবাসরত কোন মুসলমানের আজাব হবে না! পুরুষের জন্য চার বিয়ের বিধান রেখেছে ইসলাম। নারীর জন্য একটাই যথেষ্ট মনে করেছে! সেক্ষেত্রে নারী কি পুরুষের চেয়ে দূর্বল নাকি! মৃত্যুর পর স্বর্গবাসী পুরুষ পাবে সত্তুরটি করে হুর আর নারীর জন্য রাখা আছে লাল মূলা! পালক পুত্র জায়েদের সুন্দরী স্ত্রী জয়নবকে বিয়ে করতে চেয়েছিল মুহাম্মদ! শুণেছি নবীর তেরোটি স্ত্রীর মধ্যে একজন ছিল সুদর্শন বালক! মুসলমানদের প্রাণপ্রিয় নবী ছিল সমকামী!

অমানুষের অধীনে কাজ করতে ইচ্ছে করে না। সাগরে মিঠা পানির সন্ধান করা যেমন বোকামী তেমনি মরুভূমিতে ভাল মানুষের খোঁজ করাও সময়ের অপচয়। সৌদি বাদশার কতজন স্ত্রী আর কতজন রক্ষিতা আছে বলা কঠিণ। বাসা বাড়ির প্রতিটি কাজের মেয়েই বাড়ির কর্তা বা তার ছেলেদের অলিখিত স্ত্রী। গার্ডেনার বা ড্রাইভার পুরুষটি বাড়ির কর্ত্রী ও তার মেয়েদের অলিখিত

স্বামী। ইরাক কর্তৃক কুয়েত দখলের পর পত্রিকায় খবর বেড়িয়েছিল কুয়েতের আমীরের পচাঁত্তুরটি সন্তান! নিশ্চয়ই দুই চারজন স্ত্রীর গর্ভে এতগু লি সন্তান হয় নি। লৌহমানব সাদ্দামের নিষ্ঠুরতার কাহিনী অনেক শুণেছি। ওমানের সুলতান কাবুস তার পিতাকে হত্যা করে ক্ষমতা দখল করেছিল। শ্রুতি আছে, বলিউড নায়িকা পারভীন ববি কাতারের আমীরের রক্ষিতা হয়ে ছিলেন অনেক দিন। আর কত!

কাজে যাওয়া কমিয়ে দিলাম। পত্রিকায় লেখালেখি বাড়িয়ে দিলাম! প্রতি সপ্তায় আমার লিখা ছাপা হচ্ছে। পত্রিকা অফিস থেকে একদিন চিঠি এল, "আপনাকে আমরা প্রবাসী এবং বিশেষ সংবাদদাতা নিয়োগ করতে চাই।"সাংবাদিক হওয়ার দীর্ঘ দিনের স্বপ্ন পূরণ হতে যাচ্ছে! কিন্ত না, ওদের কয়েকটি শর্ত আমার পছন্দ হল না। পত্রিকা মালিকের রাজনীতির খায়েশ আছে। বিশেষ দলের প্রতি দূর্বল! সুতরাং সেদিকে লক্ষ্য রেখেই সংবাদ প্রেরণ করতে হবে! আমাকে দিয়ে হবে না। আমি এখনও বিশ্বাস করি সাংবাদিকরা দর্জি না যে কারও অর্ডার মত পোষাক বানিয়ে দেবে। যে দেয় সে সাংবাদিক নয় দর্জি।

যাদের নিয়ে আমার সহবাস, খাওয়া দাওয়া,তারাই আমার বিপদ ডেকে আনলো! একদিন জুম্মার নামাজের পর সমস্ত বাঙ্গালী আমার বাসায় চলে এল। ব্যাপার কি! পরে জানলাম আমার রুমমেট হেলাল মিয়া জেদ্দার সমস্ত বাঙ্গালীর কাছে খবর পাঠিয়েছে, "আমার রুমে একজন নাস্তিক থাকে আপনারা আসছে শুক্রবার জুম্মার নামাজের পর আসবেন ওকে শায়েস্তা করবো।" আজ সেই দিন।তাই সবাই এসেছে! অসহায় বৃদ্ধ মা বাবার খবর নেয় না এমন একজন ব্যক্তি আমাকে প্রথম প্রশ্ন করলো, "আপনি নাকি আল্লাহ মানেন না!"কে বলেছে? আমি জিজ্ঞেস করি। হেলাল মিয়া আপনার রুমমেট। বুঝতে পারলাম সব খবর নিয়েই এসেছে। দেখুন, আমি আল্লাহ মানি বা মানিনা এমন কথা কখনও বলিনি তবে ধর্মের ব্যাপারে আমার অসীম আগ্রহের কারণে অনেক সময় অনেক কথাই জিজ্ঞেস করি। আরেক জন প্রশ্ন করে, "আপনি বাইবেল পড়েন, আপনার ড্রয়ারে বাইবেল পাওয়া গেছে এসব কি ঠিক?" বললাম হ্যাঁ! বাইবেল ছোঁয়াও হারাম আপনি জানেনা? আরেক জনের প্রশ্ন? বললাম, জানার জন্য পড়ছি! উত্তেজনা বাড়ছে! কেউ কেউ বলছে পুলিশকে খবর দিতে; কেউ বলছে আমরাই ঠিক কইরা দেই! তবুও বাঙ্গালীদের ভয় লাগছে না! ভয় পাচ্ছি পুলিশের কানে গেলে হয়ত আমার জান যাবে এই ভেবে। আমার পাশের গ্রামের একজন বয়স্ক ব্যক্তি সবাইকে শান্ত হতে বললেন। আমাকে বললেন, এসব কথা আর কখনও বলবে না। রোজা কর, নামাজ পড়,ধর্মের পথে চল। একদিন দেখবে

সব ঠিক হয়ে যাবে। চলে যাওয়ার আগে সবাই মিলে আমার জন্য দোয়া করল!!

ফিরে এলাম দেশে। প্রতিজ্ঞা করলাম আর কোনদিন বিদেশে যাব না। চাঁদের দেশেও না! প্রবাসে বসে লিখা "অন্ধকার দ্বীপ" এর পান্ডুলিপি নিয়ে বাংলাবাজার দৌঁড়াদৌঁড়ি করি, প্রকাশকের খোঁজে। প্রকাশক মিলে না। ব্যবসায়ী মিলে! পান্ডুলিপি কেউ দেখে না! দেখার বিন্দু মাত্র আগ্রহও প্রকাশ করে না! সবাই টাকা চায়। মনে পড়ে আমার প্রথম বই "কতদিন আর" এর কথা। টাকা দিয়ে ছাপিয়ে ছিলাম "রুনা প্রকাশনী" থেকে। কথা ছিল প্রথমে এক হাজার বই ছাপাবে, প্রয়োজনে আরও। আমাকে কোন লাভ দিতে হবে না। বিনিয়োগ করা টাকা ফেরৎ দিলেই হবে। রুনা'র স্বত্বাধীকারী রুহুল আমীন বাবুল আমাকে এক টাকাও ফেরৎ দেয়নি! আর বই? ছাপিয়েছিল মাত্র পাঁচশ! নব্বইয়ের দশকে পন্ডিত আহমদ শরীফের এক জন্মদিনে আমি উপস্থিত ছিলাম। ধানমন্ডিস্থ তাঁর বাসায় অনেক গু ণীজনের সমাবেশ ঘটেছিল সেদিন। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী আরও অনেকে। হুমায়ূন আজাদ কি কারণে যেন আসতে পারেননি। ড.আহমদ শরীফ সেদিন দুঃখ করে বলে ছিলেন, "কোন প্রকাশক আজ পর্যন্ত আমাকে একটি টাকাও দেয়নি!" শুনে আশ্চর্য্য হয়ে ছিলাম। অত বড় লেখককেও প্রকাশকরা টাকা দেয় না! তবুও তিনি আজীবন লিখে গেছেন মানুষের জন্য দেশের জন্য।বলতে ইচ্ছে করে,এসব প্রকাশকরা বইয়ের ব্যবসায় আসে কেন? বৌ (পতিতা)এর ব্যবসা করতে পারে না!

"অন্ধকার দ্বীপ" আলোতে আসল। আমিই আনলাম। পরিবেশনের দ্বায়ীত্ব দিলাম বিশাকা প্রকাশনীকে। শাহজাহান বাচ্চু আরেক রুহুল আমীন বাবুল! বিভিন্ন জায়গায় ব্যানার টাঙ্গিয়ে দিয়েছে, "আমরা নতুন লেখকদের লেখা বই প্রকাশ করে থাকি।" নতুনদের ধরার চমৎকার ফাঁদ! প্রথমে ফাঁদে ফেল এর পর ইচ্ছে মত জবাই কর!

বইটির কথা চুন্নু জানল। ধর্ম বিরোধী অনেক কথা আছে চুন্নু শুনেছে। কাল বিলম্ব না করে গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তি আলাল উদ্দিনকে আমার কাছে পাঠাল। আমাকে বুঝিয়ে এসব থেকে বিরত রাখার জন্যে!

সবাই যখন বুঝতে পারল আমার কাছে টাকা নাই পুরোনো ব্যবহারে তারা ফিরে গেল! বিদেশ যাওয়ার আগের ব্যবহার! প্রতিবেশীরা কেউ কেউ জিজ্ঞেস করে, Òবিয়া করবা না?" মিষ্টি করে হাসি। কিছু বলি না। অতি উৎসাহীরা মাকে প্রশ্ন করে,Òপোলা বিদেশ থাইক্যা আইল,

বিয়া করাইবা না?" মা তাদের সাথে রাগ করে! বলে, বিয়া করামু খাওয়াইবো কে? একদিন শুনি মা বড় খালাম্মাকে বলছে, Òসবার পোলা বিদেশ যায় টাকা কামাইতে আর আমার পোলা বিদেশে গেছিল কবিতা ল্যাখতে!"

দিন যায়। বছর যায়! মেঝোটা এমেরিকা কানাডা যাওয়ার চেষ্টা করছে অনেক কাল ধরে কিন্ত হচ্ছে না। এখন অষ্ট্রেলিয়া যাওয়ার চেষ্টা করছে। বাবা চিঠি দিলেন, "চুন্নুর যাওয়ার দরকার নাই ওর বদলে তুমি যাও।" বাবাকে বললাম, আমি আর কোন দিন বিদেশে যাব না। বাবা রেগে লিখলেন, "বিদেশে যাইবানা দেশে কি করবা?" বললাম, ব্যবসা করুম। দরকার নাই, বিদেশ যাও। আমারও জেদ বিদেশে আর যাব না। বাবার জেদ আমার জেদে তিন বৎসর চলে গেল!

আমাদের বাড়ির সামনের বাড়িটি আকবর আলীর। পেশায় ঠেলাগাড়ী চালক। দিন আনে দিন খায়। স্ত্রী দুই সন্তান মা আর ছোট এক ভাই এই হল ওর সংসার। মাঝে মাঝে অন্য ঠেলাওয়ালা বন্ধুদের নিয়ে বাড়িতে পিকনিক করে! খাওয়া শেষে তাস খেলে! আড্ডা মারে। আমরা সব দেখি শুনি। ওরাও আমাদের দেখে আমাদের কথা শুনে! আমার খারাপ লাগে । ঠেলাওয়ালার বাড়িতে ঠেলাওয়ালারা আসবে এটাই স্বাভাবিক। আমার কিছু বলার থাকতে পারে না! বললেও ওরা শুনবে কেন?

পার্টিশন দিতে হবে। যেই ভাবা সেই কাজ! জায়গা মেপে সোজা চলে গেলাম বাজারে। মলি বাঁশের বেড়ার অর্ডার দিলাম। তিনদিন পর বেড়া তৈরী হল। এরই মধ্যে বাড়ির সবাই শুনেছে। কেউ বেড়া আনতে আমার সাথে যাবে না। একজন লোক নিয়ে বেড়া নিয়ে এলাম বাড়িতে। কেউ কোন সহযোগীতা করছে না আমাকে। রিকসাওয়ালার বৌ চেঁচামেচি শুরু করে দিয়েছে। রান্না ঘরে মা কার সাথে বিড় বিড় করে কি যেন বলছে! চুন্নু সরাসরি বলেই ফেলল, "এখানে বেড়া দিতে পারবেন না।" বললাম, বেড়া এনেছি যখন আমি দেবই। মেঝো বলল, "আমার জায়গা বাদ দিয়া বেড়া দিয়েন। ওই বাড়িতে যাইতে আমার রাস্তা লাগব।" মেঝোর জন্য রাস্তা রাখলাম না। পুরোটাই বন্ধ করে দিলাম। বিকেলে বাইরে গেলাম সন্ধ্যায় ফিরে এসে দেখি,বেড়া খুলে ফেলেছে, খুঁটি সব তুলে ফেলেছে। রাতটা জেগেই কাটল। মনের দুঃখে পরদিন সকালে বাড়ি ছাড়লাম।

দ্বিতীয়বার আমার উপর আক্রমণের আভাস পেয়ে যখন এই শহরে এসেছিলাম তখন অনেকের সাথে পরিচয় হয়েছিল। সেই পরিচিত জনদের সাথে আড্ডা মারতে

সপ্তাহে তিন চার দিন ঢাকা থেকে করতোয়া'য় ঝুলে নারায়ণগঞ্জ চলে আসি। বেলাভূমিতে বসে আড্ডা মারি। বেলাভূমি চমৎকার একটি বইয়ের দোকান। মিলন ঝিলনের বই ওই দোকানে বিক্রি হয় না। তাই শ্রুতি সাংস্কৃতিক দলের সফল সংগঠক হয়েও অসফল ব্যবসায়ী। কিছুকাল আগে শুনেছি, বেলাভূমি অস্ত গেছে। সেখানে উদয় হয়েছে অনন্তা নামের একটি শাড়ী কাপড়ের দোকান। বেশ নাকি চলে! বাঙ্গালী জ্ঞানের দিক থেকে মুখ ফিরিয়েছে শাড়ী কাপড়ের দিকে! লজ্জাহীন বাঙ্গালী ঘুষ দূর্ণীতি সন্ত্রাসের লজ্জা ঢাকতে এখন মরিয়া হয়ে উঠেছে। তবুও ভাল যে বাঙ্গালীর লজ্জাবোধ জন্মেছে!

একদিন রাস্তা পাড়াপাড়ের সময় চুন্নু আমাকে দেখে ফেলল। বাসে করে কোথায় জানি যাচ্ছিল ও। বাস থেকে নেমে আমার সামনে এসে দাঁড়াল! চোখ জলে টলমল! "ভুল হইছিল, আমারে মাফ কইরা দিয়েন। বেড়া আপনার মত কইরাই দিয়া দিছি। এখন চলেন বাড়ি যাই।" কথাগুলো বলে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। বললাম, তুই যা, কয়েক দিন পরে আমি আসব। এক বৎসর বাড়ির সাথে কোন রকমের যোগাযোগই নেই। অথচ বাড়ি থেকে মাত্র পঁচিশ কিলোমিটার দূরে আছি! বাড়ি ফিরলাম ঈদের দিন সকালে। আশপাশের কেউ কেউ আমাকে দেখতে আসছে! কিন্ত আমার মা এবং ভাই বোনদের মধ্যে কোন রকমের আগ্রহ নেই! সব কিছুই ঠিক আগেরই মত, আদি এবং অকৃতিম!

আগে দিন যেত এখন আর যায় না। শফিক রেহমানের যায় যায় দিনের কথা ভাবি, ওর দিন সব সময় একই রকমভাবে যায় কিভাবে!

চুন্নুর অষ্ট্রেলিয়ার ভিসা হয়েছে। কয়েকজনকে বলার পর আমাকেও জানাল। আমি তখন বোধ শক্তিহীন একজন জীবন্ত মৃত মানুষ। আনন্দানুভূতি উচ্ছাস কিছুই নেই আমার মাঝে। তবুও গান শুনি! নচিকেতার হাতুরী মার্কা গান! "যখন সময় থমকে দাঁড়ায় নিরাশার পাশে দু'হাত .. , It’s a gameÓ. অথবা Òসরকারী কর্মচারীÓ, কখনও বা Òবারো টাকা..Ó। সম্ভবত চুন্নুই ক্যাসেটা সংগ্রহ করেছিল। কিভাবে জানিনা হঠাৎ হঠাৎ আকাশের বিদ্যুৎ চমকের মত স্বপ্ন উঁকি দেয় আমার মনে! নচিকেতার গান আমার দুঃসময়ের সঙ্গীই শুধু নয় সমৃদ্ধ করেছে আমার মন ও মনন। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি রবীন্দ্র সঙ্গীত এবং লালন গীতি স্বর্গের গান। বাংলাদেশের মত নরকে বসে ওসব বাণী প্রধান গান শুণা যায় না। নরককে স্বর্গে পরিণত করতে নচিকেতার বিকল্প নেই। নচিকেতা আমার অন্যতম প্রিয় গীতিকার ও শিল্পী, আজও। চুন্নু সিডনী চলে গেল।

১৯৯৮ সাল। বাংলাদেশ পানির নীচে। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায়। বাবা নমনীয় হলেন। চিঠি দিলেন, “এখন কি করবা ঠিক করলা?” ব্যবসা করবো বাবাকে জানালাম। বাবা টাকা পাঠালেন। দুইটা কম্পিউটার দিয়ে ব্যবসা শুরু করলাম। বাড়ি থেকে নাঈদকে নিয়ে এলাম। কিন্ত ও আমারই মত কম্পিউটারের ক ও জানেনা! একজন মাঝারী গোছের এক্সপার্ট রিক্রুট করলাম। দিন যায়। মাস,বছর যায় কিন্ত ব্যবসা চাঙ্গা হয় না। শুধু আমার একার নয় কোথাও বাণিজ্য নেই। ব্যাংক থেকে টাকা তোলে দোকান ভাড়া ঘর ভাড়া কর্মচারীর বেতন দিতে হয়। টেনশন বেড়ে গেল।

চাকরী ছেড়ে বাবা বাড়ি এলেন। সারাক্ষণ চিল্লাপাল্লা করে বাড়ি মাথায় করে রাখেন। তাঁর ভয়ে সবাই ভীত সন্ত্রস্ত । পারত পক্ষে বাবার সামনে কেউ যায় না। আমি দোকানে থাকি, মাঝে মাঝে বাড়ি আসি। কারণ বাড়িতে অনেক কাজ চলছে। নতুন ঘর দোর তোলার কাজ। কাঠ টিন কেনার জন্যে বাবার পেছনে পেছনে হাঁটে বাজারে যাই। বাবা কখনও সখনও এটা সেটা আমাকে জিজ্ঞেস করে তবে আমার মতামত শুধুই শুণে গ্রহণ করে না। বাড়ি ঘরের কাজ শেষ করতে নয় মাস সময় লাগল। অসম্ভব সুন্দর হল দেখতে। কিন্ত কারও মন সুন্দর হল না। মন আগের মতই রয়ে গেল। মা বাবার অনিয়মিত ঝগড়া নিয়মিত হল। প্রতিদিন সকাল ও বিকাল দু'বার। ভেতরের কথাও এরা ঝগড়ার সময় বলে দেয়! প্রাইভেসী বলে কিছু আর বাকী রইল না। প্রতিবেশীরা মুখটিপে হাসাহাসি করে।

আমার ব্যবসা রেইজ করছে না কিছুতেই । সবার সাথে বাবাও চরম অসন্তুষ্ট আমার উপর। আমাকে সরাসরি কিছু বলে না বাবা। তবে বাবার মুখে আমার কথা শুণতে শুণতে মায়ের বিরক্তি ধরে গেছে। খাওয়ার সময় শোয়ার সময় আমারই প্রসঙ্গ! আমার সমবয়সীদের উন্নতি দেখে বাবার আরও রাগ হয় আমার উপর! কে কি করছে কিভাবে করছে আমি সবই দেখছি তবুও আবার আমাকে শুণতে হয় বাবার মুখ থেকে। একদিন অসহায় অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছি বাবার সামনে।বাবা আমার দিকে তাকিয়ে কঠিন প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয়,Òতুমি কি করলা?” উত্তর জানা আছে বাবার তবুও চায়! আমি দিতে পারিনা। পাল্টা প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করে , আপনার ছোট হয়েও হলুদের বাবা কতকিছু কামিয়েছে,টাকা মান সম্মান সব! আপনি কি কামিয়েছেন? কিন্ত পারিনা। এ সমাজ পিতাকে এধরনের প্রশ্ন করার কোন অধিকার সন্তানদের দেয় নি। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে একচেটিয়া আধিপত্য কেবল পিতারই। বাবা একদিন কয়েক জনকে বলছে, Òও কোনদিনই কারও কথা শুনল না। কতবার বললাম

ইয়েমেন থেকে চলে আয়, আসল না। দেখেন, কাদের আলীকে! জাপান গিয়ে কত কিছু করে ফেলল! ও ছেলে তো ওর সাথেই ইয়েমেনে ছিল।” বুকের কষ্ট বুকেই চেপে রাখি। বাবা একবারও আমাকে বলেনি যে সবাই দেশে ফিরে যাচ্ছে তুমি যাচ্ছ না কেন! তুমিও যাও। বাবার কাছ থেকে গ্রীণ সিগনাল পেলে আমিও হয়তো দেশে ফিরে আসতাম।

বাবা হজ্জ করে দেশে ফিরেছেন। গ্রামের অন্যান্য হাজী এবং সম্মানী ব্যক্তিদের সাথে বাবার চলাফেরা। হলুদরা আমাদের আত্মীয়। আমি বুঝতে পারছি ওদের সাথে রক্তের টানের চেয়ে আত্মার টানটা বেশী। হলুদের বাবা আমার বাবাকে আগে মিয়া ভাই বলে সম্বোধন করত। কিন্ত এখন আর তা বলে না! এখন বলে হাজীসাব! আগে আমাদের বাড়িতে এলে,Òমিয়া ভাই বাড়ী আছেন?” এভাবে ডাকত। এখন বলে,Òহাজীসাব বাড়ি আছেন!?” বিনা শ্রমের টাকা যেমন মানুষকে অমানুষ বানায় তেমনি ধর্ম মানুষকে রক্তের সম্পর্ক থেকে ছিন্ন করে।

আমার বিয়ের কথা শুণা যাচ্ছে! বাবা মাকে বলছে,Òওর বয়স হয়েছে, বিয়ে করানো দরকার। মানুষে জিজ্ঞেস করে পোলা বিয়া করাইবেন না হাজীসাব? শরম পাই।” মা উদাসীন ভাবে বলল, Òকরান!” পরিচিত অনেকের মেয়েই দিতে চায়, আমি এই পরিচিত পরিমন্ডলের বাইরে যেতে চাই। কিন্ত কোন চ্যানেল পাচ্ছি না। ছোট ভাইয়েরা যার যার কাজে ব্যস্ত! বাবা ষোল বৎসর পর দেশে এসেছেন পরিচিত জনের কাছেই ধর্না দেন! পুত্র দায়গ্রস্থ পিতা! প্রেম না করে ভুল করেছি! অথচ কত মেয়ে প্রেম করতে চেয়েছে আমার সাথে! পাত্তা দিই নি! হ্যান্ডসাম বয় ছিলাম তবে কোন অহংকার ছিল না। প্রেম না করার কারণ হল:খুব ভাল ছাত্র ছিলাম।মুরুব্বীরা আদর করতেন। ভালবাসতেন। অন্যদেরকে বলতেনও, “অপু’র মত ছেলে হয় না। অলঙ্কয়ার!” প্রেম করলে মুরুব্বীরা বলবে, Òছেলেটা নষ্ট হয়ে গেছে!” তাই প্রেম করার প্রচন্ড আবেগ পাথর চাপা দিয়ে রেখেছিলাম। অনেককে ভাল লেগেছে, মনে মনে দু’ একজনকে ভালও বেসেছি!

পরিচিত দু’ একজনকে ধরে নিজেই পাত্রী খোঁজা শুরু করলাম! আমার বিয়ের আমিই ঘটক! যেখানেই দেখি সব ছোট ছোট মেয়ে! নবম দশম শ্রেণীতে পড়ছে! বড়জোর ফাষ্ট ইয়ারে পড়ছে। আমার আরও বয়স্ক দরকার। অতটা সুন্দরী না হলেও চলবে কিন্ত মনের মিল না হলে চলবে না। বয়সের ব্যবধানে মনেরও ব্যবধান হয়। কেউ কেউ শুণে হাসে। বলে, Òআরে ছোটই তো ভাল! চুম্বকের মত লেগে থাকবে!” আমি অবাক হই। তবে ওদের ফাঁদে পা দিই না। অন্তত পঁচিশ বৎসর হতে হবে। চেষ্টা

চালিয়ে যাচ্ছি। একই সাথে দু' জায়গায় সন্ধান পেলাম। একে একে দুটোরই খবর নিলাম। আহামরি কিছু না। তবে চলন সই। আমার চাওয়া পাওয়ার কিছুই নেই। আগেই সবাইকে বলে দিয়েছি, এক পয়সা যৌতুক নিয়ে আমি বিয়ে করবো না। বাবা মা অখুশী। তারা মুখে কিছু বলে না। চেহারা দেখে আমি সব বুঝতে পারি। ছেলেটার কাছে আমরা কিছুই পেলাম না! তারা জানে আমার কথা নড়চর হবে না।

এবার মেয়ে পক্ষের খবর নেওয়ার পালা। দু পক্ষই খবর নিয়ে গেল । কেউ আর ফিরে এল না! এমন তো হবার কথা নয়! দু' পক্ষই আমাকে পছন্দ করেছে। আমি অকপটে সব বলেছি। পরে জেনেছি, আমার ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জাবেদ আলী, তার সব ভাই এবং চামচা আমার পেছনে লেগেছে। যাতে আমি বিয়ে করতে না পারি! তারা মেয়ে পক্ষকে বলেছে,Òছেলে নাস্তিক ,কিছুই করে না,বখাটে, টুটু করে ঘুরে বেড়ায়। দোকান টোকান কিছুই নাই। বিয়ে করার জন্য মিথ্যা কথা বলেছে দোকান আছে।" মেয়ে পক্ষের কোন দোষ নেই। এসব শুণে কে আর আগায় বলুন?

১৯৯৬ বা ১৯৯৭ সালের কথা। ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের জন্য প্রতীক বরাদ্দ হয়ে গেছে। জাবেদ আলীর পক্ষে জোর প্রচারণা চলছে। কারণ আমাদের গ্রাম থেকে ইতিপূর্বে কোন চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয় নাই। এবার সেই সুযোগ এসেছে। তাই সমস্ত গ্রামবাসী এক হয়ে জাবেদ আলীর পক্ষে কাজ করছে। "যে কোন মূল্যে জাবেদ আলীকে পাশ করানই লাগবো!" আমি স্রোতের বিপরীতে। কারণ জাবেদ আলী '৭১ পাতি রাজাকার ছিল। শেখ মুজিব রাজাকারদের ক্ষমা করেছিলেন। সে ক্ষমার প্রভাব পড়েছিল জাবেদ আলীর উপরও। মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে পায়ে ধরে বেঁচে যায় জাবেদ আলী। জনৈক মুসলিম লীগ নেতার চামচামি শুরু করে। নেতা যখন টয়লেটে যায় জাবেদ আলী সাবান তোয়ালে নিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে। একাত্তুরে পরাজিত জাবেদ আলী নেতার মন জয় করে। ধূর্ত জাবেদ আলী সুযোগ বুঝে একদিন নেতাকে বাবা ডাকে। জাবেদ আলীর বাবা ডাকে হিজড়া নেতার পিতৃহৃদয় জেগে উঠে। জাবেদ আলীকে কাছে টেনে নেয়। সেই থেকে জাবেদ আলীকে আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয় নি। নেতা বাবার সিঁড়ি বেয়ে জাবেদ আলী তর তর করে উপরে উঠতে থাকে। এখন সে একটি বড় দলের থানা কমিটির সেক্রেটারী! তার পাতানো বাবা এখন রাজনীতির মাঠের বাইরে। তাই সে এখন আর তার বাবার খবর নেয় না!

জাবেদ আলী এখন আব্দুল হান্নান সাহেবের পেছনে পেছনে ঘুরে। জাবেদ আলীর দ্বিতীয় বাবা যখন

রাজনীতির মাঠ থেকে আউট হয়ে যায় তখন বদলী খেলোয়ার হিসেবে ঢুকে এই হান্নান সাহেব। জাবেদ আলী ঘাপটি মেরে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে! আব্দুল হান্নান এমপি নির্বাচিত হয়। স্থানীয় জনগণ দিনক্ষণ ঠিক করে আব্দুল হান্নান কে সম্বর্ধনা দেওয়ার জন্য। জাবেদ আলী বিনা দাওয়াতে কোথা থেকে উড়ে আসে সরাসরি মঞ্চে! মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়িয়ে জাবেদ আলী বলা শুরু করে,Òহান্নান সাহেব একজন মহান নেতা, তিনি ইচ্ছে করলে আপনাদের দীর্ঘ দিনের দাবী এই রাস্তা স্বর্ণ দিয়ে গড়ে দিতে পারেন।” জাবেদ আলী আব্দুল হান্নানের চোখে পড়ল! সেই থেকে জাবেদ আলী আব্দুল হান্নানের সঙ্গী।

জাবেদ আলী কত নিরীহ মানুষকে বাঁশ দিয়েছে। আমীরকে মামলায় জড়িয়ে ফকির বানিয়েছে। সহজ সরল ছেলেদের অস্ত্রবাজ দ্বন্দ্ববাজ বানিয়েছে। ছোট ছোট ছেলেদের বেয়াদব বানিয়েছে। ঝামেলামুক্ত ছেলেদের ঝামেলায় ফেলে তার দলে ভিড়িয়েছে।আরও কত কি! বিচক্ষণ জাবেদ আলী ধরা ছোঁয়ার বাইরেই থেকে যায়! সেই জাবেদ আলীর জন্যে মরিয়া হয়ে মাঠে নেমেছে গ্রামবাসী! একজন মুরুব্বীকে জিজ্ঞেস করলাম, সব কিছু জেনেও আপনারা এমন একটা লোকের জন্য ভোট চাইছেন! জবাব এল,Òতুমি বুঝবানা! জাবেদ আলী যতই খারাপ হোক গ্রামের লোক! আপনা লোক! আপনা লোক পাওয়ারে থাকলে অনেক সুবিধা আছে!” এরপর আমার আর কি বলার থাকতে পারে! অথচ এই তো সেদিনের কথা,জাবেদ আলীর দেয়া অস্ত্র বহন করতে গিয়ে তারই চাচাত ভাই পুলিশের হাতে ধরা পড়ল। ক্ষমতার অপব্যবহারকারী জাবেদ আলী দলের প্রভাব খাটিয়ে চাচাত ভাইকে মুক্ত করেছিল চার লাখ টাকার বিনিময়ে।সেই টাকা জাবেদ আলীর চাচাই দিয়েছিল! বেকার ছেলেরা ক্ষমতার লোভে টাকার লোভে কেউবা সিঙ্গারার লোভে জাবেদ আলীর পেছনে পেছনে ঘুর ঘুর করে। মধু খায় জাবেদ আলীরা!

আমি আধুনিক এবং সচেতন হয়ে এরকম একজন জঘন্য ব্যক্তিকে সমর্থন করতে পারিনা। তার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পক্ষে কাজ করেছিলাম । এটা আমার গণতান্ত্রিক অধিকার। কিন্তু জাবেদ আলীরা গণতন্ত্রের কথা মুখে বলে জনগনকে বোকা বানাতে। এরা মানেনা। বিভিন্ন জনের মাধ্যমে আমাকে ভয় দেখাল জাবেদ আলী। মৃত্যু ভয়! কিন্তু জাবেদ আলী জানত না পদে পদে বাধা বিপত্তি অবজ্ঞা অবহেলার স্বীকার আমি মৃত্যু ভয় জয় করেছি।

জাবেদ আলী চেয়ারম্যান নির্বাচিত হল। তার চেলাপেলাদের হুকুম দিল,Òমেরে ফেল বদমাইশটাকে

আইনি ঝামেলা আমি দেখব।“ তবুও জানি কিভাবে বেঁচে গেলাম! জাবেদ আলী আমার পিছু লেগে রইল সুযোগের অপেক্ষায়। আমাকে দশ হাত দেখানোর সুযোগ! সেই সুযোগ এখন পেয়েছে!

আরও সতর্ক হলাম! পাত্রী খুঁজছি। নিঃসঙ্গ একজন মানুষ সঙ্গীর জন্য মরিয়া। জেদ চেপে গেল মাথায়। বিয়ে করব এবং এই এলাকাতেই। এক সুভাকাংখীর কাছে খবর পেয়ে পাত্রী দেখতে গেলাম। মেয়ের বয়স পঁচিশের কাছাকছি, চেহারা দেখলে আরও বেশী মনে হয়। বাবা অসুস্থ। মা চাকরী করে সংসার চালায়। বড় এক বোন বিয়ে হয়ে গেছে। ছোট এক ভাই এক বোন লেখাপড়া করছে।দাদার সময়ে প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল। সেকেলে মডেলে বাড়ির বড় বড় ঘর দোর তারই সাক্ষী। এখন কিছুই নেই। আমার আজন্ম লালিত পালিত কল্পনার পাত্রীর সাথে এর ন্যূনতমও মিল নেই। মেয়ে পক্ষকে জানালাম আমার পছন্দ হয়েছে! মেয়ের চাচা বললেন,Òবাবাজি,আপনাদের কোন দাবী দাওয়া থাকলে আমরা এখন আমাদের মেয়ে বিয়ে দিতে পারব না।“ জানালাম, আমাদের কোন দাবী দাওয়া নেই। Òআলহামদুল্লিাহ!“ তিনি বললেন। তিনি আরও বললেন,Òআপনার পছন্দ হয়েছে, এখন আপনার মুরুব্বীদের পাঠান; তাঁদেরও তো পছন্দের একটা ব্যাপার আছে।“ বললাম, আমার পছন্দই তাদের পছন্দ! তাঁদের আলাদা কোন পছন্দ নেই। দিনক্ষণ ঠিক হল মেয়ে পক্ষ আমাদের বাড়িঘর দেখতে আসবে।

আজ আমাদের বাড়িতে অতিথি আসবে। ত্রিশ পয়ত্রিশ জন। কোন রকমে বাজার হল। কিন্ত মা বললেন,Òআমি রান্না করা পারুম না!“ কিছুদিন আগে বোন আমাদের বাড়ি থেকে চলে গেছে। বাবা ছুটে গেলেন বোনের কাছে। বোন বাবাকে পরিস্কার জানিয়ে দিল সে আসতে পারবে না। তখন প্রায় এগারোটা বাজে। উপায় না দেখে নিজেই রান্না করা শুরু করলাম! নিজের বিয়ের নিজেই বাবুর্চী! সহযোগীতার করতে এগিয়ে এল ছোট এক ভাই যে আমার সাথে দোকানে বসে। কিভাবে কি করব ! উঠে গেলাম। চোখে মুখে অন্ধকার দেখছি। বাবা ছুটে গেলেন গুচ্ছ গ্রামে। কিছুক্ষণ পর ফিরে এলেন আমার এক দূর আত্নীয়া ফুপিকে নিয়ে। ফুপি বললেন, Òমুরগী কি ভেজে রোষ্ট বানাব নাকি এমনিই বানাবো?“ আপনার যেভাবে ইচ্ছা বানান। রোষ্ট ভালই হয়েছিল কিন্ত পোলাও যাচ্ছে তাই! ফুপির দোষ নয়। ছোট আগুনে বড় পাতিল বসানোর জন্যই এমন হয়েছে।

সময় হয়েছে অতিথি আসার। অথচ রান্না হয়নি এখনও। বাড়ির সামনে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াই আবার ফিরে এসে

রান্নার খবর নিই। আমি বাড়ির ভেতর এসেছি মাত্র, খবর পেলাম অতিথি এসে আমাদের বাড়ি খুঁজছে। দৌঁড়ে গেলাম রাস্তায়। অতিথিরা মনক্ষুন্ন! কেই একজন বলল,Òজানেন মেহমান আসবে, এখানে একজনকে দাঁড় করাইয়া রাখবেন না!” বিনীতভাবে বললাম, আমি এতক্ষণ এখানেই ছিলাম। ভেতরে গেছি মাত্র; আর আপনারা এসেছেন। দুঃখিত।

পয়ত্রিশ জন মানুষকে আপ্যায়ন করছি আমি। আমাকে সহযোগীতা করছে নাঈদ। সুন্দরভাবে কিছুই হচ্ছে না। আমার হবু স্ত্রীর বড় বোনের হাজব্যান্ড বললেন,Òবাড়িতে আর কেউ নেই নাকি?” তার বিরক্তিভাব আমার চোখ এড়াল না। কিভাবে বলি যে আমার ছোট আরও দুটি ভাই আছে ওরা ঘুরতে গেছে! বোন আসে নাই! আসলে এই পৃথিবীতে আমার কেউ নেই। আমি একা। তাই তো সঙ্গীর প্রয়োজন। একাকীত্ব দূর করতে বিয়ে করতে যাচ্ছি তোমার শ্যালিকাকে। বললাম,ওরা আশেপাশেই কোথাও হয়ত আছে!

খাওয়া দাওয়া শেষে কথা বার্তা হচ্ছে। লেনদেন নেই। কোন আনুষ্ঠানিকতা হবে না, কাবিন এক লাখ টাকা। আপনাদের পছন্দ হলে আমরা মেয়েকে দেখার অজুহাতে এসে কনেকে নিয়ে যাব। ইচ্ছে থাকা সত্বেও বৌভাতের আয়োজন আমরা করতে পারব না।এসব আমি আগেই বলেছি। তার পরও আবার কথা থাকে নাকি! কনের দুলা ভাই একটু বেশীই পাকনা। কাবিনের টাকা নিয়ে দরদাম শুরু করে দিয়েছে। যেন চতুর মালিক! প্রচন্ড চাহিদা টের পেয়ে গরুর দাম বাড়িয়ে দেওয়া আর কি! আমি পাশের ঘর থেকে সবই শুনছি। বাবাকে আগেই এসব জানিয়েছি ,বাবা রাজী হচ্ছে না দেখে পাকনা বলছে,Òঅপু’র কাছে কাউকে পাঠান,অপুকে কেউ জিজ্ঞেস করে আসুক।” বাবা চুপসে গেলেন। বাবার চেহারাটা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো। প্রচন্ড মায়া হল বাবার জন্য। কেউ একজন আমার কাছে এল। জিজ্ঞেস করার আগেই বললাম, আমি সব শুণেছি! এক লাখ টাকার এক পয়সাও বেশী কাবিন হবে না। এতে তারা রাজী থাকলে বিয়ে হবে না থাকলে এখানেই শেষ। আমার শক্ত কথায় তারা নরম হল।

কুটিল মানুষেরা যাতে সমস্যা সৃষ্টি করার সুযোগ না পায় সে জন্যেই সম্ভাব্য কম সময়ের মধ্যে বিয়ের দিন তারিখ ঠিক হল। এ মাসের পঁচিশ তারিখ। মাকে বললাম, এত অল্প সময়ে তো গয়না বানানো সম্ভব না। তোমার গয়না গুলো দিও; বিয়ের গয়না তৈরী হলে তোমার গয়নাগুলো ফেরৎ দিয়ে দেব। মা রাজী হল না। বলল,Òএত তারাতারি করছ ক্যা? গয়না বানাইয়া পরে বিয়া কর!”

বিয়ে করার অনুকুল পরিবেশ এটা নয় তবুও করতে হচ্ছে অনেক কিছু ভেবে।
শেরুয়ানী পাগড়ী ছাড়াই বিয়ে করতে যাচ্ছি। সাধারণ প্যান্ট সার্টের সাথে কোট। বেরুনোর সময় বাবা হাত ধরে বললেন, "আজ আর তুমি কিছু বইল না!" আমার সাথে আরও দুই জন আমারই মত কোট প্যান্ট পড়া। কনে বাড়িতে প্রবেশের সময় একজন বলল, "ছেলে কোন জন?" খাওয়া দাওয়া শেষ। বিয়ে পড়ানোর আগ মুহুর্তে সেই পাকনা পন্ডিত কনের বড় বোনের জামাই এল। Òতুমি সেভ কর নাই! ও তো বেঁকে বসেছে;কিছুতেই রাজী হচ্ছে না।" দাঁড়ি উঠার পর থেকে আজ পর্যন্ত আমার গালে ব্লেড বা খুর আমি লাগাইনি। মেয়ে এবং মেয়ে পক্ষের সবাই এই লোকও দেখেছে আমার মুখে খোঁচা খোঁচা দাঁড়ি। বরং আজ অনেক ছোট করে এসেছি। সেভ করার দুই তিন দিন পরে যতটুকু বড় হয়। ঠিক সে রকমই দেখতে। আমার ভাললাগে! অনেকে পছন্দ করে।একদিন লঞ্চে করে ঢাকা থেকে গ্রামে ফিরছি,এক ছেলে বলেই ফেলল, Òআপনাকে দারুণ লাগছে! প্লিজ কখনও ফেলবেন না।" আর এই চন্ডাল বলে কিনা..!

বউ নিয়ে বাড়ি ফিরলাম। সবার মন খারাপ। বউ পছন্দ হয়নি। সাথে একটা সুতাও দেয়নি। মেয়েটাকে এভাবে বিদায় করল কিভাবে! মা পাঁচশ টাকার একটা নোট দিয়ে বাড়ীর প্রথম বউকে বরণ করতে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। মায়ের প্রচুর গয়না গাঁটি! বাবা দিয়েছে, আমি দিয়েছি ছোটরা দিয়েছে। মধ্য রাত্রি। শুয়ে শুয়ে গল্প করছি। এমন সময় ফোন বেজে উঠল! সুদূর লস এঞ্জেলস থেকে আমার সুভাকাংখী ডালু! "অপু ভাই, congratulation! অপ্রত্যাশিত ফোন অপ্রত্যাশিত শুভেচ্ছা। খুব ভাল লাগছে। এর পরপরই আরেক কল ইতালী থেকে ফুয়াদ,আমার এক সময়ের সহপাঠি বন্ধু। ও দেশান্তরী হওয়ার পর তেমন যোগাযোগ নেই। অথচ প্রাপ্য শুভেচ্ছা জানাতে ভুল বিলম্ব বা কার্পণ্য কিছুই করেনি। আসলে মানুষ মানুষের কাছে তেমন কিছুই চায় না। ইচ্ছে করলেই সুসম্পর্ক বজায় রাখা সম্ভব।

সকাল হল। ঈভা'র ঘুম ভেঙ্গেছে অনেক আগেই। লোক জনের আনাগোনা বাড়ল। বউ দেখে কেউ কোন কথা বলে না। একে অন্যের দিকে তাকায়! মাকে জিজ্ঞেস করে,Òবউয়ের সাথে আর কি কি দিছে?" মা কোন জবাব দেয় না। বাবা মা অন্য ঘরে ঝগড়া শুরু করে দিয়েছে! পাশের ঘর থেকে আমরা শুণছি। কান পেতে শুনার চেষ্টা করছে নববধূ। ওর কানে হাত দিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরে বলি, মন খারাপ করো না,একদিন সব ঠিক হয়ে যাবে। সাতদিন পর দোকানে যাই। ভাল লাগে না। একদিন পর ফিরে আসি। বাবা মা আড়চোখে আমার দিকে তাকায়।

সোজা ঘরে ঢুকে জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞেস করি,গতরাত কেমন কাটল? পরে জেনেছি,ভোর রাতে ওকে ডেকে তোলে ধান সেদ্ধ করতে দিয়েছে! প্রচন্ড কষ্ট পেলাম। এসেছে কাজ তো করতেই হবে তাই বলে এত তারাতারি! আমার গরীব বড় খালাম্মা নতুন বউকে একদিন দাওয়াৎ দিয়ে খাওয়াল। আর কোন আত্মীয় খোঁজ নিল না। অথচ বাবা তার এক আত্মীয়কে পঁচিশ হাজার টাকা দিয়ে কালার টিভি দিয়েছিলেন তার মেয়ের বিয়েতে। আরেক জনের বিয়েতে দিয়েছিলেন পাঁচ ভরি স্বর্ণের হার। ওর প্রতি সবার অবহেলা অনাদরের কারণে আমার ভালবাসা লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ে যাচ্ছে।

নতুন বউকে একদিন দুঃখ করে বলছি, আমার কপালটাই খারাপ। হয়তো তোমারও। তানা হলে এমন হবে কেন! ও পাল্টা প্রশ্ন করে কি হয়েছে? আমার খালাম্মার বাড়ি আর তোমার বড় বোনের বাড়ি ছাড়া অন্য কোথাও দাওয়াৎ আমাদের ভাগ্যে জুটল না! অথচ তোমার মাতবর মান্নান চাচা কত মানুষকে বুঝায়! বউকে বলি সত্যি কথা হল, তোমার শ্বশুর বাড়ীর পক্ষ আমার উপর নাখোশ তাই তোমার কপাল পুড়েছে। আর আমার শ্বশুর বাড়ীর পক্ষ জ্ঞানপাপী। সবই বুঝে কিন্ত হারকিপ্টে; তাই আমার কপাল পুড়েছে। আমার ছোটটা, মেঝো অষ্ট্রেলিয়া গেছে অনেক দিন হল। সেঝোটা কবির কয়েক বৎসর আগে থেকেই দুবাইতে আছে। বিয়ের খবর দিন তারিখ সব জানে। উপহার দূরের কথা ফোন করে বড় ভাবীকে শুভেচ্ছা জানানোর প্রয়োজনীয়তা টুকুও অনুভব করেনি ওরা যতটা করেছিল ডালু এবং ফুয়াদ। নিজেদের দুঃখ নিয়ে নিজেরাই মজা করে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি। কিন্ত কিছু কিছু কষ্ট এত ভারী যে উড়তে চায় না।

নতুন বউ গ্রামে ব্যবসা শহরে। দুটোই আমার। দুদিকেই খেয়াল রাখতে হচ্ছে। কোন দিকেই শান্তি নাই। নাঈদকে দোকানে রেখে ঘন ঘন বাড়ি আসি। মা একদিন বলেই ফেলল, Òতুমি এত বাড়ি আস নাঈদ আসে না ক্যা?" মাকে বলতে ইচ্ছে করে বিয়ে আমি করেছি, নাঈদ করে নাই। কিন্ত বলতে পারি না।

বিয়ের পর প্রথম ঈদ এল। আমি তাকিয়ে আছি মা বাবা আর প্রবাসী ছোট ভাইদের প্রতি। ভাবছি ওরা আমাকে চমকে দেওয়ার মত কিছু করবে। না ওরা কিছুই করল না। আগামিকাল ঈদ। শীতের দিন। চাদর গায়ে জড়িয়ে হাঁটা শুরু করলাম। ঘন্টা খানেক হেঁটে নিকটবর্তী উপশহর পাগলা বাজার থেকে দুটি শাড়ী কাপড় কিনে নিয়ে এলাম। বউয়ের হাতে দেওয়ার আগে ভাবলাম ও ভীষণ খুশী হবে। আমাকে অবাক করে দিয়ে ও বলল,Ò বুড়া মানুষের মত কাপড় কিনা শিখছ? যাও ফিরাইয়া

দিয়া আস।” কাপড় ফেরৎ দিতে গেলাম। দোকানদারকে বললাম,যার জন্য নিয়েছি সে পছন্দ করেনি। টাকা ফেরৎ দেওয়ার সময় দোকানীর তীর্যক দৃষ্টি আমার মনকষ্ট বাড়িয়ে দিল। হাঁটতে হাঁটতে অনেক রাতে বাড়ি ফিরলাম। প্রাণপ্রিয় স্ত্রী অঘোরে ঘুমুচ্ছে। পাশে শুয়ে ভাবছি একে নিয়ে আমি কতদূর যেতে পারব। কখন ঘুমিয়ে পরেছি জানিনা।

গতকাল ছিল ঈদের দিন। ঈদ উৎসব আমি পালন করিনা। তাই ঈদের দিন সবার জন্য আনন্দের হলেও আমার জন্য কষ্টের। ঈদেরই সূত্র ধরে আজ খলিল ভাইদের বাড়িতে আমাদের দুইজনের দাওয়াৎ! রাতের খাবারের জন্য। আমার প্রিয় খাবার। গরুর মাংশ আর রুটি। মানা করতে ইচ্ছে করে কিন্ত পারি না। এ যে খলিল ভাই! আমার আপন জন। আমার আত্নার আত্নীয়। গত ইউপি নির্বাচনের সময় আমি যখন রাজাকার জাবেদ আলীর প্রতিদ্বন্দ্বীর পক্ষে কাজ করছিলাম তখনও আমার চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী মা বাবা ভাই বোনের বিন্দু মাত্র সহানুভূতি বা সমর্থন আমি পাইনি। আমার হয়ে দুটি কথা বলেনি কাউকে। অথচ এই খলিল ভাই বলেছে। একদিন, গাফর চৌধুরী নামের একলোক খলিল ভাইয়ের কাছে এসে বলেছে,Òতুমি তো জান, অপু জাবেদ আলীর বিপক্ষেকাজ করছে। তাই তোমাকে বলছি,অপুকে তোমাদের বাড়িতে আসতে নিষেধ করে দিও।” খলিল ভাই আমাকে নিষেধ করেননি। বরং গাফর চৌধুরীকে মুখের উপর উচিৎ জবাব দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন,“অপু কার ইলেকশন করবে না করবে সেটা অপু'র ব্যাপার। ওর সাথে আমার ভাল সম্পর্ক। ওকে আসতে নিষেধ করব কেন?” যেমনটি ডালু বলেছিল জাবেদ আলীকে,Òআপনার ইলেকশন করলে যদি অপু ভাইয়ের সাথে না চলা যায়, তাহলে আপনার ইলেকশন করলাম না।” একটা গালিও দিয়েছিল জাবেদ আলীকে ডালু! সেটির ভাষা মার্জিত নয় বলে লেখা সম্ভব হল না।

খলিল ভাইয়ের আয়োজন, আপ্যায়ণ এবং আন্তরিকতায় বিন্দু মাত্র ঘাটতি নেই। আমাদের খাওয়ালেন। আমার প্রিয় খাবার। পেট পুড়ে! কিন্ত তাঁকে একবারও দাওয়াৎ দিয়ে খাওয়াতে পারিনি। মনে পড়ে গেল আমার আরেক প্রিয় মানুষের কথা। মেঝো ভাবী। তাজমীরি। আমার চোখে তাজমীর শরীফের মতই তিনি সুন্দর পবিত্র। তাজমীর শরীফ আমি দেখিনি কোনদিন দেখার ইচ্ছেও নেই। তাজমীর ভাবীকে দেখেই আমি সন্তুষ্ট। বাংলাদেশের মত নোংরা জায়গায় এঁদের মত এত ভাল মানুষ আছে ভেবে আমি অবাক হই।

ঈদের তিন চার দিন পর, ঈভা'র বড় বোন, বোনের জামাই বেড়াতে এল আমাদের বাড়িতে। সাথে ফুটফুটে দুটি মেয়ে সন্তান। বড়টার নাম সুখী ছোটটার নাম নদী। কেউ যদি সুখীকে জিজ্ঞেস করে তোমার বোনের নাম কি? সুখী উত্তর দেয়, Òগাঙ্গের মত কি যেন একটা নাম! সুখীদের বাড়ির সবাইকে আমার ভাল লাগে শুধু পন্ডিত মিয়া বাদে! মেহমান দেখে বাবা নিড়ানি হাতে নিয়ে পালানে গেলেন! বাড়ির পাশের জমিকে আমরা পালান বলি। বেগুন খেতে। বেগুন গাছের যত্ন নিতে! মায়ের কাছে গিয়ে বললাম, “মেহমান এসেছে। মায়ের জবাব, “আমি কি করুম! তোমার মেমান আইছে, তুমি কি খাওয়াইবা তুমি যান।” বাজারে গেলাম। মুরগী আর কি কিনে যেন বাড়ি ফিরলাম। এসে দেখি, চূড়াইন থেকে মেঝো খালাত ভাই এসেছে ভাবীকে নিয়ে। রান্না হলে ডাইনিং টেবিলে খাবার দিলাম। টেবিল দেয়ালের সাথে লাগানো বলে একসাথে চারজনের বেশী বসা যায় না। তাই নতুন আত্মীয়দেরই প্রথম বসতে দিলাম। ঈভা কি আনতে যেন মায়ের ঘরে গেছে। মা ঈভাকে বলল, Òতোমাগ মেমানরে খাইবার দিলা, আমার মেমানরা খাইব না?”

বিকেল। মেহমানরা চলে যাবে। থাকতে বলি।কিন্ত জোর দিয়ে বলি না। ওরা থাকে না। ওরা কি সব বুঝতে পেরেছে? অতিথিদের এগিয়ে দিয়ে সোজা ঘরে ফিরে আসি।

নজরুল সঙ্গীত বাজছে। সোহরাব হোসেন গাইছেন, “চিরদিন কারও সমান যায় না।” ভাললাগে। ভলিউম বাড়িয়ে দিই। পাশের ঘর থেকে মা বলছে, “সন্ধ্যা সময় এতজোরে গান বাজায় কে?” গান মায়ের কানে Gun হয়ে বাজে! বন্ধ করে দিই টেপরেকর্ডার।

কিছুদিন পর। আরেক দিনের কথা। ভরদুপুরে পন্ডিত মিয়া এসেছে কোন একটা জরুরী সংবাদ নিয়ে। আমি পছন্দ না করলেও সে আমার স্ত্রীর বড় বোনের হাজব্যান্ড। এবং এ বাড়ির আত্মীয়। মা চায়ের কাপে দুধ দিতে গেলে বাবা বলল, Òচা খাওয়াইয়া বিদায় কর।” মায়ের ঘরের দিকে আসতে থাকা আমি শুনে ফেললাম।

ঈভা'র সাথে ওর দুলাভাইয়ের কি কথা হয়েছে আমি জানিনা। রাতে শোবার আগে আমাকে বলল, Òপরশু দিন অসুর গঞ্জ যাব।” বললাম, জরুরী কাজ থাকলে অবশ্যই যাবে। যাবে মানে! তুমিও আমার সাথে যাচ্ছ, ঈভা বলল। না আমি যাব না। অবশ্যই যাবে। যাব না বললাম। তুমি আমার সাথে যাচ্ছ, ঈভা আগের চেয়ে বেশী জোর দিয়ে বলল। জোর করে আমার কাছ থেকে কিছুই আদায় করতে পারবে না। আমি ভালবাসার কাঙ্গাল। জীবনে কারও ভালবাসা পাইনি। একটু ভালবাসার বিনিময়ে সবকিছু উজাড় করে দিতে রাজী আছি। ঈভাকে বললাম

একটা গল্প শুন। এমেরিকার একজন সাবেক প্রেসিডেন্টের গল্প। তাঁর নাম আমার মনে নেই। রাজনীতিবিদরা সাধারনত অভদ্র এবং চাপাবাজ হয়। চাপার মধ্যেই তাদের জনপ্রিয়তা। যে যত বড় চাপাবাজ সে তত বড় নেতা।কিন্তু আমার গল্পের নায়ক প্রেসিডেন্ট ছিলেন সম্পূর্ণ এর বিপরিত। ভদ্র লোক। তিনি ছিলেন দুই কথার মানুষ। ঈভা আমার দিকে তাকায়! মানে তিনি ছিলেন স্বল্পভাষী, দুটি'র বেশী কথা তিনি কখনওই বলতেন না। এক অনুষ্ঠানে তাকে দেখে এক মহিলা তার পাশের মহিলাকে বলছে, Òআপনি কি জানেন,এই প্রেসিডেন্ট কখনও দুটির বেশী কথা বলেন না।" পাশের সুন্দরী মহিলা বলল, Òআমি তাঁকে দুটির বেশী কথা বলাবো।" প্রথম মহিলা বলল, Òপারবেন না।" দুজনের মধ্যে বেটিং হয়ে গেল। সুন্দরী মহিলা প্রেসিডেন্টের কাছে গিয়ে বলল, Òমাননীয় প্রেসিডেন্ট, আমি একজনের সাথে বাজি ধরেছি যে, আজ এই অনুষ্ঠানে আমরা আপনার কাছ থেকে দু'টির বেশী কথা শুনব।" প্রেসিডেন্ট সুন্দরী মহিলার দিকে তাকিয়ে বললেন, Òআপনি হেরেছেন।" এরপর থেকে ঈভা দ্বিতীয়বার কোন কথা বললে আমি যদি বলি, মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী, আপনি হেরেছেন। ও আর জোরাজুরি করে না। দু'টি ঘর পাশাপাশি। কিন্তু দু'ঘরের মাঝামাঝি দু'টি টয়লেট কাম গোসলখানা আছে। সামনে বিশাল বারান্দা। আড়াই ফুট দেয়ালের উপর দৃষ্টিনন্দন গ্রীল। প্রতিটি ঘরে দু'টি করে কামরা। এক কামরা থেকে অন্য কামরায় যাওয়ার জন্য ভেতর দিয়ে দরজা আছে। দুই কামরার জন্য একটি টয়লেট। সবচেয়ে বড় কেচি গেটটা সামনে,ছয় ফুট। ডানে একটা ছোট কেচিগেট আছে,পশ্চিম দিকের রাস্তায় বের হওয়ার জন্য; সেটি চার ফুট। আর পূর্বদিকের গেটটা এক পাল্লা দরজার মত। উপরে গ্রীলের অংশে গ্রীল এবং দেয়ালের অংশে সীট দেওয়া। পূর্ব দিকে অবস্থিত মা বাবার ঘরের সাথে যোগাযোগের জন্য এই গেট। রান্না ঘর,বাইরের টয়লেট, গোসলখানা এবং টিউবওয়েলে যাওয়ার জন্য এই গেটটি বেশী ব্যবহৃত হয়। পূর্বদিক থেকে আমার কামরাটি দ্বিতীয়। ডাইনিং টেবিলটি বারান্দায়।ঠিক আমার মাথার কাছাকাছি। একদিন ভেতরে আমরা দুইজন। অনেক দুষ্টুমি করছি। হঠাৎ কি প্রয়োজনে আমি বের হয়েছি। দেখি বাবা ডাইনিং টেবিলের চেয়ারে বসে আছে! ভীষণ লজ্জা পেলাম। বাবা চলে যাওয়ার পর ডাইনিং টেবিলটা প্রথম কামরার সামনে নিয়ে এলাম। কিছুক্ষণ পর বাবা এলেন। টেবিলটা টেনে আগের জায়গায় আনলেন। ঠিক আগের চেয়ারটিতেই বসে সিগারেট ধরালেন! ঘরের ভেতরেও আমাদের খুব সাবধানে কথা বলতে হয়! ঈভা যখন রান্না ঘরে যায় আমি তখন বারান্দায় গিয়ে বসি! ওকে একটু পর পর আড়চোখে দেখি! অন্য কেউ যেন

বুঝতে না পারে। সময় সুযোগ মত রান্না ঘরে ঢুকে পড়ি।আগে যা কখনও করিনি। লাকড়ি দিয়ে রান্না করছে। আগুনের তাপে ঈভার চেহারা লাল হয়ে যায়। প্রচন্ড মায়া লাগে। অঞ্জলী ভরে পানি ধরার মত করে ওর মুখমন্ডল ধরি। ক্ষাণিক উঁচু করে ঘর্মাক্ত কপালে চুমো দিই। কে যেন এদিকে আসছে! তারাতারি বের হয়ে যাই। আগের জায়গায় গিয়ে বসি!

ঈভার বাবার শ্বাসকষ্টের অসুখ আছে। ঈভা সব সময়ই কম বেশী কাশে। কোন কারণে ঠান্ডা লাগলে কাশি বেড়ে যায়। চিন্তিত হলাম। ডাক্তার দেখালাম। অনেকগুলো অসুধ দিল। কোনটা কখন খেতে হবে একটা কাগজে লিখে ওর ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় সেটে দিলাম। শহরে যাওয়ার আগে আবার মনে করিয়ে দিই যেন ভুল না করে।

আমাদের বিয়ের বয়স দু মাস হল। ঈভার বয়স পঁচিশের কাছাকাছি। আমার ত্রিশের উপরে। সঠিক জানা নেই আমার। দুজনেই সচেতন। এখন সন্তান না নিলে অলক বা পলক কে পরনির্ভরশীল রেখেই বিদায় নিতে হবে। আমার ছেলে মেয়ে কোন রকমের সাহায্যের জন্যে কারও দ্বারস্থ হবে এমনটা আমি ভাবতেই পারিনা। তাছাড়া কে সাহায্য করবে? আমার ছোট ভাইয়েরা! খলিল ভাই এবং ডালু ছাড়া আমি আর কাউকেই দেখি না। হ্যাঁ অলক পলক আমার ছেলে মেয়ে! অনেক আগেই নাম ঠিক করে রেখেছি । ছেলে হলে অলক প্রাপ্ত মুকুট আর মেয়ে হলে পলক প্রাপ্তি খোঁপা।
দুই সপ্তাহ ধরে আমরা চেষ্টা করছি অলক বা পলকের জন্য। এখনও কারও দেখা নেই! ঈভাকে জিজ্ঞেস করি ওরা এল কি না বুঝব কিভাবে? বুঝব! কিভাবে? পরে বলব। না,এখন বল। না পরে। না এখন। ঈভা আর আমি ছাড়া ঘরে আর কেউ নেই। কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল, “পেটে বাচ্চা এলে মিনস্ট্রেসন বন্ধ হয়ে যাবে। তাহলে ওরা আসবে কিভাবে!? তার মানে? ঈভা পাল্টা প্রশ্ন করে আমাকে। আমি বলি, ষ্টেশন বন্ধ হয়ে গেলে গাড়ী ভিড়বে কোথায়? হা হা করে হেসে উঠি দুজনেই।

ঈভা যেদিন আমাকে বলল, Òষ্টেশন বন্ধ হয়ে গেছে।” আমার আনন্দ আর ধরে না! মা ছিল সামনে। আমি ঘর থেকে বের হয়ে গেলাম। মা ঈভাকে জিজ্ঞেস করছে, Òকি বন্ধ হইছে? ও এত খুশী ক্যা?” ঈভা কোন উত্তর দিল না। ইছামতির পাড়ে এসে বসলাম। শীতের শেষ। মরা নদী। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে ভরা নদী। বাঁধভাঙ্গা স্রোত! বেশীক্ষণ স্থির হয়ে বসে থাকতে পারলাম না। হাঁটা শুরু করলাম। কিছুক্ষণ হেঁটে একটু সামনে গিয়ে আবার বসে পড়লাম! কি করব ভেবে পাচ্ছি না!

সন্ধ্যার সাথে সাথে ঘরে ফেরা আমার অভ্যাস। আজ অনেক আগেই ফিরেছি। দুধ হরলিকস কিনে এনেছি। শোবার আগে দুধ খাইয়ে দিচ্ছি ঈভাকে। ঈভা গ্লাস ধরতে চায়, আমি ওকে ধরতে দিই না। ঈভাকে ধরে বেড়ে উঠতে সাহায্য করি। ধরে শুইয়ে দিই। তলপেটে কান পেতে বাচ্চার অস্তিত্ব টের পেতে চেষ্টা করি। কখনও বা পেটে কান পেতে হ্যালো হ্যালো করি। মনের আনন্দে একদিন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলছি হ্যালো হ্যালো। পাশের ঘর থেকে মা কাকে যেন জিজ্ঞেস করছে , Òও কার সাথে কথা বলছে!" এভাবে কেটে গেল তিন মাস।

তারিফকে কোরিয়া পাঠানোর জন্য পাশের গ্রামের আদম বেপারী জামির হোসেনের কাছে টাকা জমা দিয়েছি। কথা ছিল দুই মাসের মধ্যে পাঠাবে । টাকা দিতে হবে দুই লাখ ত্রিশ হাজার। এক সাথে সব টাকা দিয়ে বললাম, যত শীঘ্র পারেন পাঠিয়ে দিন। জামির আমাকে বলল, Òবেপারীদের বিশ্বাস করে কেউ এইভাবে এক সাথে সব টাকা দেয় না। আপনি দিলেন।" দুই মাস পাড় হওয়ার পর জামির খবর পাঠাল, Òতিন দিন পর তারিফের ফ্লাইট। প্রথমবার হংকং থেকে ফিরে এল তারিফ। কিছুদিন পর আবার চেষ্টা। এবার সরাসরি সিউলের টিকিট! কাজ হল না। ফেরৎ এল। টাকা নেওয়ার সময় বেপারীরা বলে, Òএয়ারপোর্ট কন্টাকে আমরা লোক পাঠাই তাই ঢুকা নিশ্চিত। আপনার লোক ঢুকার পরই আমরা টাকা নেব। আগে নেব না।" আসলে সবই মিথ্যা। টাকা ওরা আগেই নেয়, কোন না কোন ভাবে। আর নিজের যোগ্যতায়ই এয়ারপোর্ট পাড় হতে হয় যা তারিফের নেই। তাই ফেরৎ এসেছে। জামির হোসেনকে বললাম, হল না যখন তাহলে টাকা ফেরৎ দিয়ে দেন। ও বলল, Òতারিফকে আর পাঠানো যাবে না। নাঈদকে নিয়া আসেন পাঠাইয়া দেই।" বললাম, নাঈদের অস্ট্রেলিয়া যাওয়ার কাগজ পত্র এসে গেছে। ও যাবে না। আপনি টাকা দিয়ে দেন। Òকিছুদিন পরে নেন" জামির হোসেন বলল।অন্তত কিছু টাকা দেন নাঈদের জন্য অনেক টাকার প্রয়োজন আমি বললাম। হায়েনার মত হাসি দিয়ে জামির হোসেন বলল, Òপাবেনই কয় টাকা!" বুঝতে অসুবিধা হল না যে, ফেঁসে গেছি। আর কিছু না বলে চলে এলাম।

চুন্নুর চেষ্টায় আরেক বেপারী জিয়ার মাধ্যমে নাঈদের অস্ট্রেলিয়া যাওয়ার জোর প্রচেষ্টা চলছে। আমি এবং নাঈদ দোকানের ভেতর বসা। ফোন এল, Òinvitation letter" এসে গেছে। আগামী সপ্তায় এ্যাম্বাসীতে দাঁড়াতে হবে ভিসার জন্যে। নাঈদ হঠাৎ বদলে গেল! ও আমার চেয়ে বয়সে অনেক বড় এমনভাবে কথা বলছে! ও

এ্যাম্বাসীতে দাঁড়াল কিন্ত ভিসা হল না। যোগ্যতা থাকলে তো হবে। কবীর নাঈদ তারিফ রন্জু অজ্ঞ হয়ে নিজেদের বিজ্ঞ মনে করে। কুয়ার ব্যাঙের মত! মা বোন ওদের জন্য গর্ববোধ করে! কিন্ত ভিসার জন্য লাইনে দাঁড়ালে অন্যলোক তা মনে করে না। লোকগু লো কি বোকা! মানিক চেনে না!

টাকার জন্য জামির হোসেনের অফিসে যাই। ফকিরের পুল। আমার মনে হয় জায়গাটার নাম বাটপাড় পাড়া হলে ভাল হত। টাকা দেয় না। নানা রকমের অজু হাত দেখায়। অজু করাই থাকে কেউ গেলেই হাত দেখায়। একদিন বললাম, তাহলে নাঈদকে পাঠিয়ে দেন। বলল, Òএয়ারপোর্টে এখন ভীষণ কড়াকড়ি। রিস্ক নেওয়া যাবে না। আপনি গেলে এক সপ্তাহের মধ্যে পাঠাইয়া দেই।” না, আমি যাব না। দোকান আছে। নতুন বউ আছে! তাছাড়া আমি গেলে একাই যাব। আপনার কাছে আসব কেন? মনে হচ্ছে শুণে লজ্জা পেল! এরপর যখনই টাকার জন্য যাই, Òআপনি গেলে বলেন এক সপ্তাহের মধ্যেই পাঠাইয়া দেই!” এ কথা বলে। এখন আর এ কথা বলতে লজ্জা পায় না!
ডাক্তার বলেছে, Òপঁচিশে জানুয়ারী বাচ্চা হবে। আর মাত্র সাত দিন বাকী! পৃথিবীর সমস্ত আনন্দ আমার মনে। কিন্ত আনন্দ বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না। ব্যবসার অবস্থা শোচনীয়। সংসারের ব্যয় বহনে অক্ষম পিতার সন্তান হয়ে জন্ম নেবে আমার সন্তান! কালো মেঘে ঢেকে যায় আমার সোনালী আকাশ। পরক্ষণেই মেঘ ভেদ করে উঁকি দেয় রক্তিম সূর্য্য! বিদ্যুৎ বেগে চেয়ার ছেড়ে উঠি। বুঝতে পারি রিভলভিং চেয়ারটি পাগলের মত ঘুরছে কিন্ত পেছনে ফিরে দেখার সময় নেই আমার। সোজা জামির হোসেনের অফিসে চলে যাই। জামির আছে। ভেতরে অস্থিরতা, বুঝতে দিই না। বলি, টাকাগু লো আজকে দেবেন? যা ভেবে এসেছি জামির তাই বলল।সেই পুরোনো কথা! “আপনি গেলে বলেন এক সপ্তাহের মধ্যে পাঠাইয়া দেই।” টিকিট কাটেন। আমি বললাম। জামির আমার মুখের দিকে হা করে তাকিয়ে আছে। বিশ্বাস করছে না। কি ব্যাপার! তাকিয়ে আছেন কেন? টিকিট কাটেন। আবারও বললাম। আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। জামির বলল। আমি যাব। তবে এক সপ্তাহের মধ্যেই আমাকে পাঠাতে হবে! জামির নিশ্চিত হল। তাহলে বসেন। কথা আছে। আবার কি কথা!? আমি জিজ্ঞেস করি। জামির বলল, Òরেট অনেক বেড়ে গেছে। তবে আপনার কাছ থেকে অতবেশী আমি নেব না। আমাকে তিন লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতে হবে।” অনেক কথার পর বললাম এই মূহুর্তে আমার কাছ থেকে কোন কথা আদায় করতে পারবেন না আপনি। পৌঁ ছে গেলে আমি বিবেচনা করব। ইচ্ছে হলে

আমাকে পাঠাতে পারেন। টিকিট কেটে নিয়ে এল জামির। ছাব্বিশে জানুয়ারী দুপুর বারোটায় ফ্লাইট।

টিকিট হাতে নিয়ে বাড়ি গেলাম। ঈভা পুকুর পাড় গেছে। পুকুর পাড় ওদের গ্রামের নাম। সন্ধ্যা নেমে আসছে। না আজ আর পুকুর পাড় যাব না। একা ঘরে আমি। চারপাশে চোখ রাখি। কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত থেকে আনা ঝিনুকের ঝাড়, দোয়েল চত্বর থেকে কেনা মাটির মটকা! দেয়ালে সাটা ক্যাঙ্গারুর চামড়া চোখে পড়ে। কত সুন্দর করে ঘরটা সাজিয়েছি! মা একদিন বলেছিল, “মেয়াগো অভ্যাস! খালি নিজের ঘর সুন্দর করলেই চলবো?” বলতে ইচ্ছে করে আমি তো সবই সুন্দর করতে চেয়েছি। তোমাদের জন্যই তো পারছি না। কিন্ত আমি বলি না। ঘর আমার কাছে স্বর্গের মত। নিজের ঘরে যার শান্তি নেই সে আর কোথাও শান্তি পাবে না। আর নিজের ঘরে যারা অশান্তি ডেকে আনে তারা কোথায় শান্তি খোঁজে আমি জানিনা। পাশে ঈভা নেই। খালি খালি লাগছে। আমি চলে গেলে ঈভা'র কি এরকম লাগবে? খালি খালি! শূণ্য শূণ্য!

বিকেলে ঈভাদের বাড়িতে এলাম। এ বাড়িতে আমার আসতে ইচ্ছে করে না! স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি না। এবং লজ্জা লজ্জা লাগে! মনে পড়ে, ঈভা একদিন আসার কথা বলেছিল। আমি আসতে চাইনি। ও জোরাজুরি করছিল। তখনও ঈভাকে প্রেসিডেন্টের গল্পটি বলা হয়নি! আমি যখন আসবোই না বলে ওকে জানালাম,ও টলমল চোখে বলেছিল, Òসব সময় শুধু তোমার কথাই থাকবে?” তারপর থেকে মাঝে মধ্যে আসা হয়। কিন্ত ঘরের বাইরে প্রয়োজন না পড়লে বের হই না! কিন্ত পন্ডিত মিয়া! আমার ঠিক বিপরীত। সকালে না আসলে বিকেলে আসবেই। প্রতিদিন অন্তত একবার আসা চাই। শ্বশুর বাড়ি বলে কথা! বিকেলে এলে, শ্বাশুরীদের নিয়ে গোল হয়ে বসে গল্প করে! এ বাড়ির ছেলেরাও এমন করে না। ছেলের চেয়েও বেশী!

কিছুই করার নেই। তবুও থাকলাম তিন দিন। এর আগে এতদিন থাকা হয়নি কখনও। চলে আসার দিন সবাইকে জানালাম। শুণে শ্বশুর মশাই বললেন, Òএ সময় মানুষ বিদেশ থেকে দেশে আসে আর তুমি যাচ্ছ!” ঈভাকে বললাম, ঠিক পাঁচ বৎসর! থাকতে পারবে? সন্তানের বয়স যেদিন পাঁচ বৎসর পূর্ণ হবে আমি সেদিনই দেশে ফিরে আসব। এসে ওকে ভাল একটা স্কুলে ভর্তি করে দেব। সকালে স্কুলে দিয়ে আসব আর বিকেলে গিয়ে নিয়ে আসব। গ্রামেই একটা কিছু করব। ঈভা বলল, Òপারব।”

ফিরে এলাম আমাদের বাড়িতে। বাবা মায়ের সাথে একদিন থাকি! আবার কবে দেখা হবে নাকি হবে না! কে বলতে পারে। রাতের খাবারের পর বাবাকে সব বললাম।

আরও বললাম, কালই আমি চলে যাচ্ছি দোকানে। নাঈদকে সব বুঝিয়ে দিতে হবে। পরশু দুপুরে আমার ফ্লাইট। আর হ্যাঁ কাউকেই বলার দরকার নেই।

আজ পঁচিশ তারিখ! ভিন্ন গ্রহের এক বাসিন্দার এই গ্রহে আগমনের কথা!

বাবা আগ্রহ নিয়ে বাজার করলেন! মাকে তারাতারি রান্নাবান্না করার জন্য তাগাদা দিচ্ছেন! কিন্তু মা কান দিচ্ছে না। মাকে জানানো হয়নি। অথচ নিকট আত্নীয় জাপান ফেরৎ আবুল অথবা দূর আত্নীয় ইতালী প্রবাসী হারু যখন আামদের বাড়িতে আসে মা অস্থির হয়ে যায় ওদের আপ্যায়ন করার জন্য। মা যদি জানত আমিও আজ টাকার দেশে যাচ্ছি। মা কি অস্থির হত ভাল ভাল খাবার তৈরী করার জন্য? খাবার খেয়ে আর দেরী করি না। দ্রুত বেগে ঘর থেকে বের হই। আজ বেশ রোদ উঠেছে। টের পাই বাবা আমার পেছনে পেছনে আসছে এগিয়ে দেওয়ার জন্য। কিন্তু আমার সাথে তাল মিলিয়ে হাঁটতে পারছে না। পেছনে ফিরে তাকাই। বাবা অনেক পেছনে তবুও হাঁটছে! লম্বা মানুষ। বয়সের কারণে ভগ্নস্বাস্থ্য । বাবা সামাণ্য কুঁজো হয়ে হাঁটছে। প্রচন্ড মায়া লাগে বাবার জন্য। দাঁড়িয়ে পড়ি। বলি, বাবা আর আসতে হবে না। বাড়ি চলে যান।

নাঈদকে হিসাব নিকাশ সব বুঝিয়ে দিলাম। আমি যাওয়ার পর কি করতে হবে তাও বলে দিলাম। এরপর গেলাম আমার ফুফু জানের বাসায় দেখা করতে। তারপর পাশের বাসায় আমার বন্ধু রাশেদের সাথে দেখা করতে। এমন সময় ফোন এল। তারিফ করেছে গ্রাম থেকে। কি ব্যাপার? জিজ্ঞেস করি। Òভাস্তি হইছে।" কি করব বা কি করা উচিৎ ভেবে পাচ্ছি না। আমার অবস্থা দেখে রাশেদ হাসছে! যেন আর কারও সন্তান হয় না। অথবা ভাবছে, Òসন্তান হলে মানুষ এমন করে!" সন্তান ভূমিষ্ঠের কথা শুনে আমার যে অনুভূতি হয়েছিল বন্ধু রাশেদ তার একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী। মোড় পর্যন্ত হেঁটে এসে আমাকে Òবিকল্প" টেক্সিতে তোলে দিল রাশেদ।

রাত বারোটায় পুকুর পাড় পৌঁছলাম। গলার আওয়াজ শুণে শ্বাশুরী দরজা খোলে দিল। পলককে নিয়ে ঈভা শুয়ে আছে কিন্তু ঘুমোয় নি। কাছে গিয়ে ঈভা'র কপালে চুমো খেলাম। ধন্যবাদ দিলাম আমাকে একটি মেয়ে সন্তান উপহার দেওয়ার জন্য। আমার পছন্দ মেয়েই ছিল ঈভা'র ছিল ছেলে।   মেয়েকে কোলে নিলাম! কোলে নিতে পারিনা! কিভাবে ধরবো! ব্যথা পাবেনাতো! মেয়ের চোখের দিকে আমি তাকাচ্ছি কিন্তু ও কোন দিকে তাকাচ্ছে বু ঝতে পারছি না! ঈভাকে জিজ্ঞেস করি, এভাবে তাকাচ্ছে কেন?

ঈভা বলল, "প্রথমে এভাবেই তাকায়। এখনও লক্ষ্য ঠিক করতে পারছে না। পরে ঠিক হয়ে যাবে।" মেয়েকে পাশে নিয়ে শুয়ে আছি। আর মাত্র ঘন্টা তিনেক পরেই একে ছেড়ে চলে যেতে হবে! ঘুম আসছে না।
ভোর পাঁচটা। বিছানা ছেড়ে উঠি। হাত মুখ ধুয়ে জামা কাপড় পড়লাম। শ্বাশুরী নাস্তা দিয়ে গেলেন। নাস্তা খেয়ে ঈভা'র পাশে গেলাম। শ্বাশুরী ওর পাশেই বসা। সাবধানে থেকো বলতে বলতে ঈভা'র কপালে চুমো দিলাম। কপালে চুমো আমার আদরের সর্বোচ্চ বহিঃপ্রকাশ। পলক ঘুমোচ্ছে। মনে মনে বললাম, মা মণি, তোমার জন্যই যাচ্ছি। তোমার কাছেই ফিরে আসব।

নয়টায় জামিরের অফিসে হাজির হলাম। কিছুক্ষণ পর স্কুটারে করে এয়ারপোর্ট পৌঁছলাম। Òঅপু ভাই পাঁচশ টাকা দেন। গাড়ীভাড়া নাই আমার কাছে।" জামিরকে টাকা দিলাম। বোর্ডিংপাশ নিয়ে আমার সিটে গিয়ে বসলাম। বিমান উড়ে যাচ্ছে সামনের দিকে,দ্রুত বেগে। আমার মন পড়ে আছে পুকুর পাড়।

হংকংয়ে চারদিন যাত্রা বিরতির পর ৩১শে জানুয়ারী সিউল পৌঁছলাাম। তিন দিনের দিন কাজে যোগ দিলাাম। সময় কম। মাত্র পাঁচ বৎসর! এর মধ্যে টার্গেট পূরণ করে দেশে ফিরতে হবে। মেয়েকে নিয়ে স্কুলে যেতে হবে। আমি পলককে আমার মনের মত করে গড়ব। কারও উপর ভরসা করে ঝুঁকি নিতে আমি রাজী নই।

আজ কাজে প্রথম দিন। সন্ধ্যা ০৬:০০ থেকে সকাল ০৭:০০ পর্যন্ত ডিউটি। কাজ দেখে সব শুণে ভয় পেয়ে গেলাম। মেসিনের সাথে পাল্লা দিয়ে কাজ শেষ করে বাসায় ফিরলাম সকালে। কোন রকমে স্নান সেরে শুয়ে পড়ি। দু'চোখে রাজ্যের ঘুম। শরীরে প্রচন্ড ব্যথা। রুমমেট ডাকছে, Òসময় হইয়া গেছে, উঠেন।" আমি উঠি না। আবার বলছে, Òকাজে যাইবেন না?" ঘুম হয়েছে কি হয়নি বুঝতে পারি না। শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। রুমমেট বের হওয়ার সময় বলল, Òআর মাত্র পনের মিনিট বাকী আছে।" ঈভা আর পলকের কথা মনে পড়ল। সময় মাত্র পাঁচ বৎসর! টার্গেট সারা জীবনের পাথেয়। পাথরের মত পড়ে থাকা অবস্থা থেকে লাফ দিয়ে উঠতে গিয়ে মুখ দিয়ে বেড়িয়ে এল একটি মাত্র শব্দ আহ্! প্রথম বার দাঁড়াতে পারলাম না। দ্বিতীয় চেষ্টায় পা রাখলাম মেঝেতে। ভর পড়তেই মনে হল গোড়ালির চামড়া ফেঁটে রক্ত ঝরছে।

আমার পাশের রুমে থাকত রনজু। আমি বাড়ি থেকে আসার পর নাঈদ রনজুকে ওর রুমে দিয়ে ও আমার পাশের রুমে চলে এসেছে! এই নাঈদ কি না করেছে জীবনে! কলেজ পড়ুয়া তিনটি মেয়ে আমার দোকানে প্রায়ই

আসত। দোকানে কাষ্টমার না থাকলে বসে বসে গল্প করত আমার সাথে। আমাকে শ্রদ্ধা করত হয়তো ভালও বাসত কেউ। ওদেরই একজন নীগার। বন্ধু ড়ার মেয়ে। বাবার চাকরীর সুবাদে নারায়ণগঞ্জ থাকত। নীগার একদিন আমাকে বলে, “আপনার ভাইটা আপনার মত না, অন্যরকম!” কি হয়েছে ? নীগার বলে না। আমার পীড়াপিড়িতে নীগার বলল, “সব বলতে পারব না তবে একটু বলছি, নাঈদ আমাকে বলেছে,” আপনার তো অনেক বান্ধবী আছে, আমার সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েন; আমার খুব দরকার!” আমার বিয়ের কিছুদিন আগের কথা, বাড়ি এসেছি; যেদিন ফেরার কথা সেদিন না ফিরে ভাবছি আরও একদিন পরে ফিরব। দুপুরের আগে নাঈদ ফোন করে আমাকে জিজ্ঞেস করল, Òআজ কি আপনি দোকানে ফিরবেন?” বললাম, না। আগামীকাল ফিরবো। দুপুরে মা বাবা তুমুল ঝগড়া শুরু করে দিল ! এ অবস্থায় থাকা যায় না। কোন রকমে চারটা খেয়ে দোকানের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। বিকেলে বাসায় ফিরে আমার চোখ চড়ক গাছ। আমার বেডের নীচে কিছু সময় আগে ব্যবহৃত কনডম! বাড়িওয়ালার ছোট ছোট দু'টি মেয়ে এসে যা বর্নণা করল তাতে আমার মাটিতে মিশে যাওয়ার অবস্থা। নাঈদ একটা মেয়ে নিয়ে এসেছিল ঘরে। দরজা বন্ধ করলেও জানালা খুলেই মেলামেশা করছিল! বাচ্চা মেয়ে দু'টি সঙ্গমরত অবস্থায় ওদের দেখে ফেলে! বালিশের

উপর চিরকুট লিখে রেখে আমি চলে গেলাম ফুফু জানের বাসায়। লিখে গেলাম, তুই এই লিখা পাওয়ার সাথে সাথে গ্রামে চলে যাবি। আমি না বলা পর্যন্ত আর আসবি না। পরের দিন সকালে বাসায় ফিরে দেখি ও লিখে গেছে, Òআপনি কি শুনেছেন জানিনা, তবে যা শুনেছেন সবই মিথ্যা!” এ বাসায় আগে সম্মান পেতাম এখন শুধুই লজ্জা পাই। বাসা ছেড়ে দিলাম।

একটু দূরে নতুন বাসা নিলাম। বাড়িওয়ালীকে বলে দিলাম, আমার দোকান বন্ধ হয় রাত নয় টায়। আমার অনুপস্থিতিতে ওর দিকে একটু খেয়াল রাখবেন। ও বেশী দুষ্টুমি করে। দশটার পরে বাসায় এলে ওকে ঢুকতে দেবেন না। কার খেয়াল কে রাখে! গ্রাম থেকে ফিরে একদিন শুণি, এ বাড়ির বুয়ার আঁচল ধরে এরই মধ্যে একদিন টান দিয়েছিল। ওর সাথে একজন চোরের সম্পৃক্ততার কথা শুনেছিলাম ডালুর কাছে! আমি ওকে শোধরানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে বাবা মা চুন্নু সবাইকে বলেছি। কেউ আমার কথা কানে নেয়নি!

একদিন ফোন করেছি বাড়িতে, ঈভা বলল, Òনাঈদ কাজের মেয়েটাকে বলেছে, Òভাবীকে জিগাইছ দিব নি!” শুণে রাগে ক্ষোভে দেশে ফিরে আসতে চাই। ঈভা বারণ করে। বলে, Òচিন্তা কইরো না। আমি ভাল থাকলে কেউ

খারাপ করা পারবো না।" ওর কথা বিশ্বাস করে আমি আশ্বস্ত হই। নাঈদকে ফোনে ধরতে না পেরে চিঠি লিখি, জীবনে অনেক কিছুই করেছিস। বাড়ি নষ্ট করিস না। পশু আর মানুষের মধ্যে তফাৎ হল, মানুষের মনুষ্যত্ববোধ আছে। পশুর নেই। পশু গর্ভধারিনি মা বা ঔরসজাত সন্তানের সাথে মেলামেশা করতে পারে কিন্ত মানুষ কিছুতেই তা পারে না। কারণ সে মানুষ।

কাজে বেশী কষ্ট হলে ঈভা পলকের কথা বেশী বেশী মনে করি। তাতে সাহস বাড়ে। একদিন কষ্টকে জয় করি। সোৎসাহে উৎসাহে কাজ করছি। মাসের পর মাস চলে যাচ্ছে। প্রতিদিন দু' তিনবার ফোন করি বাড়িতে। মা ও মেয়ের খবর নেই। কে কি খেয়েছে বা খাবে। স্নান করেছে কি করে নাই বা কখন করবে। কোন কাপড়টা পড়েছ, মাথার চুল কি ভেজা না শুকিয়েছ? ঠান্ডা লাগে না যেন। লিপষ্টিক কোন রংয়েরটা ..! আরও কত রকমের কথা! একদিন ঈভা বলল, Òএত ফোন কর কেন বাড়িতে?" তোমাদের জন্য চিন্তা করি। তাছাড়া কথা বললে ভাললাগে তাই। Òনা এত ফোন কইরো না। কেউ পছন্দ করে না।" কে পছন্দ করে না জিজ্ঞেস করি, ঈভা উত্তর দেয় Òসবাই।" একদিন ঈভা'র কাছে শুণলাম বড় বোন নাকি বলেছে, Òএত ফোন করণ লাগে নাকি। বউ পোলাপান রাইখ্যা আর কেউ বিদেশ যায় না।" তবুও আমার ফোন করা কমেনা! দুরে থেকেও কাছে থাকার চেষ্টা করি।

আমি বিদেশে আসার পর আমার জন্য সবার আদর ভালবাসা হঠাৎ করেই বেড়ে গেল। আমার স্ত্রী কন্যা সবার চোখের মণিতে পরিণত হল। পলক হল বাড়ির কেন্দ্রবিন্দু। ওকে কেন্দ্র করেই যেন সমস্ত বাড়িটি ঘুরছে। কিন্ত আমি কিছুতেই ভুলতে পারি না আমার প্রতি অবহেলা অপমানের কথা। নববধূর প্রতি অসম্মানের কথা। তাই মেপে মেপে বাড়ি খরচের টাকা পাঠাই। বাবা মা হতাশ হল।

ফোন করি ঈভা ধরে। প্রথমেই জিজ্ঞেস করি, পলক কেমন আছে? কি খেয়েছে? কত বড় হয়েছে? কথা বলতে পারে? বাবা ডাকে? দাঁত উঠেছে? ঈভা অসন্তুষ্ট হয়।এরপর ফোন করলেই ঈভা ধরেই রাগ হয়ে বলে, Òধর তোমার মেয়ের সাথে কথা বল।" মেয়ের মুখনিসৃত যে কোন শব্দই আমার কাছে অমৃত সুধার মত লাগে। ঈভা'র সাথে কথা বলা কমে যায়। মেয়ের সাথে বেড়ে যায়। ঈভা মেয়েকে প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে!
শ্বাশুরী চাকরী করে সংসার চালায়। অসুস্থ শ্বশুরের চিকিৎসাও চলে ওই চাকরীর পয়সা দিয়ে। বুঝতে পারি খুব কষ্ট হয় বেচারীর।এরপরও বিয়ের উপযুক্ত মেয়ের

কথা ভেবেই হয়তো বারান্দার কাজে হাত দিয়েছিল। শেষ করতে পারেনি। মাঝ পথে থেমে আছে কাজ। টাকা পাঠিয়ে দিলাম। ঈভাকে বললাম, বারান্দার কাজ শেষ কর। গ্রীল লাগাও কেচিগেট লাগাও রুমটা কমপ্লিট কর সেই সাথে ঘরের দরজা দু'টিও নতুন লাগিও। রং করা যেন বাকী না থাকে। শ্বশুরের সাথে একদিন ফোনে কথা বলছি, কথা বলতে পারে না কাশির কারণে। জানাল, Òবেশ ঠান্ডা পড়েছে তাই কাশি বেড়ে গেছে।” বললাম, ঈভা আপনাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবে; ওর সাথে ঢাকায় গিয়ে ভাল ডাক্তার দেখান। পরে ঈভাকে বলে দিলাম, আমার শ্বশুর মশাইকে নিয়ে যত শীঘ্র সম্ভব ঢাকায় গিয়ে ভাল একজন ডাক্তার দেখাও।

আরও বেশী কাজ করি। ছুটির দিনে ছুটি কাটাই না।ওভার টাইমে কাজ করি। তারাতাড়ি বাড়ি ফিরতে হবে। পলককে নিয়ে এখন পর্যন্ত একদিন ঘুরতে পারলাম না, খেলতে পারলাম না। অথচ অন্যের বাচ্চাদের নিয়ে কত খেলেছি। দুষ্টুমি করেছি। বাচ্চাদের সান্নিধ্য আমার ভাললাগে। মোশরাফ চাচার দোকানের বেঞ্চে বসে হিনা, সুমীদের সাথে দুষ্টুমি দেখে একদিন কে যেন মায়ের কাছে গিয়ে বলেছে, তোমার পোলারে বিয়া করাও না ক্যা? মেয়াগো সাথে খালি দুষ্টামি করে!” আমার বয়স তখন ত্রিশের উপরে আর হিনা, সুমীর বড় জোড় সাত বা আট বৎসর! কষ্টে বুকটা ফেঁটে যায়। বাংলাদেশের মানুষগু লো যে কবে মানুষ হবে!

আড়াই বৎসর পাড় হল বাড়ি থেকে এসেছি। ঈভা'র কন্ঠে কাতরতা। Ò বাচ্চা হওয়ার পর অনেক দিন বুঝতে পারি নাই।এখন খুব খারাপ লাগে। কবে আসবা? ভাললাগে না।” তুমি বললে এখনই চলে আসব। না আর কয়দিন থাক।” আমার চিন্তা দুশ্চিন্তায় পরিণত হয়। ও আমাকে চিন্তা করতে মানা করে । আমি নিশ্চিন্ত হই। তিন বৎসর হতে যাচ্ছে, কয়দিন বাকী। একদিন বলল, Òকোমরে প্রচন্ড ব্যথা।” বললাম, দেরী না করে ভাল ডাক্তার দেখাও। ওর বাবাকে সাথে নিয়ে ঢাকায় গিয়ে বড় ডাক্তার দেখাল। কোন অসুখ নেই! ডাক্তার বলল, Òআপনার হাজব্যান্ড কোথায়? বিদেশে থাকে। কতদিন যাবৎ? তিন বৎসর!” ডাক্তার মুচকি হেসে বলেছে, Òএতদিন কেউ বাইরে থাকে! বিয়ের পর বেশী দিন আলাদা থাকা ঠিক নয়।” সব শুণে বললাম, আমি চলে আসি। ও বলল, Òদরকার নাই।” ঈভাকে বললাম, আমার শত্রুর অভাব নেই। একটু দোষ পেলেই সেটাকে অনেক বড় বানাবে। আমার মাথাটা অনেক উঁচু। শত্রুরাও তা জানে। কষ্ট হলে বলবে আমি সাথে সাথে দেশে চলে আসব। আমার মাথাটা নত হয়

এমন কাজ করোনা। ও বলল, Òচিন্তা কইরো না।" ও চিন্তা করতে নিষেধ করলেও আমার চিন্তা হয়।

একদিন সকাল দশটায় ফোন করলাম। অনেকক্ষণ রিং হয়ে লাইন কেটে যায়। কেউ ধরে না। কয়েকবার চেষ্টার পর ঈভাকে পেলাম। কি ব্যাপার! বাড়ির সব কোথায় গেছে? আমি জিজ্ঞেস করি। ঈভা হ্যালো বলার পর আর কোন কথা বলছে না! কোথায় যেন হারিয়ে গেছে মনে হল। অনেকক্ষণ পর সম্বিৎ ফিরে পায়। নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, Òও তুমি!" কোথায় গেছিলা? আমি জিজ্ঞেস করি। Òঘরেই তো! নাঈদকে ভাত খাওয়াচ্ছি। বাবা মা ছোটরা কেউ বাড়িতে নেই। সবাই বাইরে গেছে।" একটা ঘরে দুটো কামরা। একদিকে ভাতের হাঁড়ি,তরকারীর পাতিল, থালাবাসন থাকে অন্যদিকে মা বাবা। বাবা মা'র বেডের কাছেই টেলিফোনটা রাখা ছোট্ট একটা টেবিলের উপর। ভেবে পাই না কোন ধরনের ভাত খাওয়াচ্ছিল । তাই ফোন রিসিভ করতে এত সময় লেগেছে!

আরেক দিনের কথা। ঈভা এখন অনেক চালাক! আগের চেয়ে অনেক সতর্ক! নাঈদকে আমার দরকার কি একটা কাজের কথা বলবো যেন। নাঈদ কোথায়? নাঈদকে দাও। Òবাড়িতে নাই।" খুব দরকার দেখ আছে কিনা। ঈভা বলে, Òএই যে আসছে! কথা বল!"

অন্য একদিনের কথা, বাড়িতে ফোন করেছি। ফোন ধরেছে পলক! ওর পাকনা পাকনা কথা শুণে আমি অবাক! তিন বৎসরও হয়নি এখনও অথচ এত কথা বলতে পারে! কেউ হয়তো জিজ্ঞেস করেছে, "কে ফোন করেছে?" পলক বলছে, " কে আবার! আব্বু!" মেয়ে আমাকে বলে, "তুমি আম্মুর সাথে রাগ কর কেন? আম্মু আমাকে শুধু মারে।" বুকের কষ্টে মুখে আমার কথা আসে না । চোখ ভিজে যায় জলে। আমি ঈভা'র সাথে রাগ করি! আমার মেয়েকে মারার কার খোঁজে পাই। বুঝতে অসুবিধা হয়না একটুও যে, পলককে দূরে দূরে সরিয়ে রাখার জন্যেই এই বিনা অপরাধের মার! ঈভা এসে ফোন ধরতেই জিজ্ঞেস করি, তুমি পলককে মার কেন? ঈভা জবাব দেয়, "মারুম না! শুধু বিরক্ত করে!"

একদিন প্রচন্ড বৃষ্টি হচ্ছে। শ্বাশুরীর কথা মনে পড়ল। সাথে সাথে ঈভা'র কাছে ফোন করে জানতে চাই, দেশে বৃষ্টি কেমন হয়? Òহয় মানে! প্রচুর বৃষ্টি।" ঈভা জানাল। রান্না করতে আমার শ্বাশুরীরর খুব কষ্ট হয় তাই না? ও কথা বলে না। আমিই আবার বলি, দু হালী রড সিমেন্টের খুঁটি, টিনের বেড়া আর ভিটি পাকা করতে মোট কত টাকা

খরচ হবে । মিস্ত্রীর সাথে কথা বলে আমাকে শীঘ্রই জানিও। আমি বিশ্বাস করতাম, মানুষ মানুষের জন্যে। তাই ধনীরা গরীবদের সাহায্য করে।একা ধনী হয়ে গরীবদের মাঝে বাস করে প্রকৃত সুখী হওয়া যায় না। আত্মীয়কে সাহায্য করা মানে নিজের আত্মাকেই সাহায্য করা।

আরও বেশী ফোন করি বাড়িতে। মেয়ের সাথে কথা বলা কমিয়ে দিলাম। ঈভা'র সাথে আজকাল অনেক সময় কথা বলি। ওর কন্ঠে কাতরতা নেই। ব্যথার যন্ত্রণা নেই। অনেক বেশী হাসি খুশী! যেমন ছিল বিয়ের পর! আমার টেনশন বেড়ে যায়। বাড়িতে একটা শয়তান আছে। ঈভাকে সতর্ক করেছি হাজারবার, যেন শয়তান থেকে দূরে থাকে। আগে কখনও আমার সাথে মিথ্যা কথা বলত না। ইদানিং বলে। একদিন হাসতে হাসতে আমাকে বলল, “আগে ছিলাম বোকা! এখন হয়েছি বুদ্ধিমান!!” আগে ওদের বাড়িতে যেতে চাইত। গিয়ে অনেক দিন থাকত। এখন যেতে চায় না! গেলেও থাকে না! একদিন আমাকে বলল,Òপরশু দিন আমাদের বাড়িতে যাব। অনেক দিন যাবৎ আমাদের বাড়িতে থাকি না, এবার গিয়ে বেশ কিছুদিন থাকব।” বললাম, ঠিক আছে।

আজ ঈভা'র পুকুর পাড় যাওয়ার কথা। ভাবলাম, খাওয়া দাওয়া সেরে দুপুরের পরে হয়ত যাবে। বাংলাদেশ সময় এগারোটার দিকে ফোন করলাম আমাদের বাড়িতে । ধরল মা। কিছুক্ষণ কথা বলার পর মা'ই বলল, ঈভা তো সকালে পুকুর পাড় চলে গেছে ওদের বাড়িতে। একজন কাজের মেয়ে পাওয়া গেছে, আনতে গেছে। বিকেলে চলে আসবে। ফোন করলাম পুকুর পাড়। ঈভা আমাকে বলে, Ò ইচ্ছে ছিল এবার আমাদের বাড়িতে অনেক দিন থাকবো! কিন্ত থাকতে পারব না।” কেন? কি হয়েছে? থাক। আমি বলি। ও বলে, Òনা থাকতে পারব না। একজন কাজের মেয়ে পাওয়া গেছে! ওকে নিয়ে আমি আজ বিকেলেই চলে যাব!” আমি বলি, কাজের মেয়েকে নিয়েই তুমি তোমাদের বাড়িতে থাক। বেড়ানো শেষ হলে ওকে নিয়ে চলে আসবা, ব্যাস। ঈভা থাকতে রাজী হয় না! আমাকে নানা কথা বলে বুঝানোর চেষ্টা করে! আমি সব বুঝতে পেরেছি! বৃষ্টি শেষে স্বচ্ছ আকাশের মত পরিস্কার! দিনের আলোর মত ঝকঝকে!

ঈভা চলে আসে বিকেলে! বেশী বয়সে বিয়ে করেছি। ফুটফুটে একটি মেয়ে আছে আমার। সবদিকে চিন্তা করে বিয়ে টিকিয়ে রাখতে চাই। কদিন পরে ঈভাকে পাঠিয়ে দিই ওদের বাড়িতে। যেতে চায় না। জোর করে পাঠাই। বলে দিই, আমি না বলা পর্যন্ত আসবে না। নিয়মিত ফোন

করি পুকুর পাড়। দশদিনও হয়নি এ বাড়িতে এসেছে। যাওয়ার জন্য অস্থির হয়ে গেছে! আমাকে বলে, “এখানে থাকলে মানুষ নানান কথা বলে। বাবা শ্বাসকষ্টের রোগী। পলকের শরীর ভাল না। তাছাড়া ডাক্তার বলেছে, আবহাওয়া চেঞ্জ করা দরকার!” আরও কত কথা..! পুকুর পাড় থেকে হাতিয়া বড়জোড় চার মাইল। এই দূরত্বে আবহাওয়া চেঞ্জ! আমার মন গলে না। কিন্ত বুঝতে পারি পরকীয়ার আকর্ষণ কত দূর্বার।

ঈভা পুকুর পাড় যাওয়ার মাস খানেক পড়ে। নাঈদ চলে এল কোরিয়া। আমার ঘোর আপত্তি উপেক্ষা করে জামির হোসেনের মাধ্যমে চলে এসেছে। বাবা ফোনে আমাকে জানাল, Òনাঈদ গতকাল কোরিয়া চলে গেছে। তোমার ওখানে গেছে?” বলি, না। খোঁজ নিও। ঠিক আছে। বাবাকে একদিন বলেছিলাম, এখানকার অবস্থা খুবই খারাপ। প্রতিনিয়ত ধরপাকর চলছে। ও যেন কিছুতেই না আসে। আসলে আমার বাসায় উঠতে দেব না। বাবা জবাব দিয়েছিল, Òশুধু তোমার কাছেই খারাপ! আনসারের পোলায় গেল। চাকরী ধইরা দেশে টাকাও পাঠাইয়া সারছে! আর তুমি কিনা সব সময় বল অবস্থা খারাপ! ” নাঈদ এসেছে দুই সপ্তাহের বেশী। আমার বাসায় আসেনি। চিন্তা করি। পরিচিত সবার সাথে যোগাযোগ করে ওর সংবাদ জানার চেষ্টা করি। মনে মনে বলি, আমার কাছে আসতেই হবে! দিনের পর দিন কে খাওয়াবে? থাকবে কোথায়? চাকরী না পেয়ে একদিন সত্যিই চলে আসে। আমি জানি, চাকরী পেলে কোনদিনই আসতো না, এমনকি যোগাযোগও করত না!

ঈভা চলে এসেছে আমাদের বাড়িতে। ফোন করে নাঈদের সংবাদ জানাই। ঈভা আমাকে বলে, “তোমার যতই কষ্ট হোক, নাঈদকে চাকরীর ব্যবস্থা করে দিও!” স্বামীর চেয়ে লম্পট দেবরের জন্য দরদ বেশী! নাঈদকে দেখলে আমার অনেক কথা মনে পড়ে! বুকের ভেতর যন্ত্রণা অনুভূত হয়। চোখ টাটায়। ওকে অন্য জায়গায় থাকার ব্যবস্থা করে দিই। একলাখ উন ক্যাশ এবং সাথে একটি ব্যাংক কার্ড দিয়ে বলি, টাকা লাগলে জানাইস। এই একাউন্টে পাঠিয়ে দেব। কার্ড দিয়ে তোলে নিস।

বাড়িতে ফোন করি। ঈভা নাঈদের কথা অতি উৎসাহে জানতে চায়। আমি সব বলি। আমার কথা কিছুই জিজ্ঞেস করে না। পরের দিন আবার ফোন করি ঈভা আমার সাথে কথা না বলে মেয়ের কাছে রিসিভার দেয়। মেয়েকে ফিস ফিস করে শিখিয়ে দেয় বল, Òনাঈদ বাবাকে দাও!” আমি সব শুনতে পাই! আমি যাকে দেখতে পারি না তাকে বাবা ডাকতে শিখিয়েছে! প্রতিটি ক্ষেত্রে সংবিধান লংঘন! মেয়েকে বললাম, নাঈদ তো এখানে নেই, আগামীকাল কথা বলো।

কাজ থেকে ফেরার পথে দুটি কলিংকার্ড কিনে নিয়ে এলাম। বাসায় ফিরে নাঈদকে ফোন দিলাম, সঞ্জু'র ফোনটা তোর কাছে নিয়ে রাখিস, পলক তোর সাথে কথা বলতে চেয়েছে। দেশে লাইন গেলে তোর নাম্বারে দিয়ে দেব। ডাইরেক্ট হয়ে যাবে যতক্ষণ ইচ্ছে কথা বলিস। দুটি কলিংকার্ড। দুটি মোবাইল ফোন। বাংলাদেশে লাইন ঢুকার সাথে সাথে অপর মোবাইলে লোকাল নাম্বার চেপে 69 সিষ্টেমে ধরে রাখি।

ফোন ধরল বাবা। কিছুক্ষণ কথা বলার পর নাঈদ মায়ের সাথে কথা বলতে চাইল। মা ছিল অন্য ঘরে। বাবার সাথে ঝগড়া করে মা কয়েকদিন যাবৎ অন্য ঘরে থাকে। বাবা মাকে ডাকলোঃ Òনাঈদ তোমার সাথে কথা বলতে চায়।" মা এল না। নাঈদ বললঃ মা আমার সাথেও কথা বলবে না!" শুনতে পেলাম ঈভা বাবাকে বলছেঃ আমার কাছে দিয়েন! বুঝতে পারলাম পাশেই চাতক পাখির মত দাঁড়িয়ে ছিল ঈভা।

রিসিভার হাতে নিয়ে ঈভা বলছেঃ হ্যালো, কে? নাঈদ?
নাঈদঃ হ্যাঁ! দাদা ভাই ফোনে কথা বলার ব্যবস্থা করে দিল। (সতর্কতা)
ঈভাঃ নাঈদ! অ-নে-ক দিন!
(ব্যাকুল হয়ে নাঈদের কথার অপেক্ষা না করে আবার বলছে)
ইস্!এত দিন পরে ফোন করলা!
কিছুক্ষণ নীরবতা।
নাঈদঃ রিসিভার একটা খুইল্যা রাইখো!
নীরবতা কিন্ত বুঝা যায় ঈভা'র হার্টবিট অনেক বেড়ে গেছে।
নাঈদঃ চিন্তা কইরো না। একজন একজন কইরা সবাইরে নিয়া আসুম!
ঈভাঃ (দেড় দুই মাসের অনাহারী! শারীরিক ক্ষুধা নিবৃত্ত করতে সুধা পাগল কিশোরীর মত কিন্ত নির্লজ্য হাসি হেসে বলছে) নিয়া গেলে তো ভালই হইত!
ঈভাঃ তোমার পাশে কেউ আছে?
নাঈদঃ আমার এক বন্ধু আছে ন..
(নাঈদের কথা শেষ হতে পারে না!)
ঈভাঃ (কেউ দেখে বা শুনে ফেলার ভয়ে চোর যেভাবে কথা বলে) রাইখ্যা দেও! রাইখ্যা দেও! চাকরী ধইরা পরে ফোন কইরো!

পরের দিন।
ঈভাঃকে? নাঈদ!?
(অপেক্ষা না করে আবার বলছে)
তোমার পাশে কেউ আছে? (আজ শুরুতেই সতর্কতা!)

নাঈদ: কিছু বুঝা যাচ্ছে না। আস্তে কথা বল! রাখ রাখ আমি ফোন করতাছি।
ঈভা: কখন করবা? অহনই!?
নাঈদ লাইন কেটে দেয়!

ঈভা'র কোন কথার কি অর্থ তা আমি ছাড়া আর কে ভাল জানে। এখন নাঈদ অবশ্য জানে! কিশোর কিশোরীর বাঁধভাঙ্গা জোয়ারের মত গোপন অভিসারের কথোপকথন নিজ কানে শুনে কোন সে স্বামী ধৈর্য্য ধারণ করতে পারে। ছয় মাস পূর্বেই ঈভা'র উপর তালাক ফরজ হয়ে গিয়েছিল। নিজ কানে শুনার পর আজ ওকে তালাক না দিলে চরম অন্যায় হবে! সব ধরনের সম্পর্কই টিকে থাকে বিশ্বাসের উপর। সেই বিশ্বাসেরই যেখানে মৃত্যু হল এরপর সম্পর্ক জীবিত রাখে সাধ্য কার! তালাক দিলাম। কেন দিলাম তাও বললাম। ঈভা আমার নিজ কানে শুনা কথা অস্বীকার করে! আমাকে বলে, Òওইখানে বিয়া করবা দেইখ্যা আমার সাথে এমন করতাছ!” বিয়ের কিছুদিন পরে ওর ছোট বোন রত্না আমাকে বলেছিল, Òকি জিনিসটা নিলেন কয়দিন পরে বুঝবেন!”

টেলিফোনে তালাক দিয়েছি আজ সাতদিন হল। তালাকের পরদিন খুব ভোরে আমাদের বাড়িতে এসে কান্না কাটি করেছে নাকি! পরে শুনেছি। বাবা সব শুণে বললেন, Òএটা কি করলা?” ঠিক কাজটি করলাম। আপনি তো সারাজীবন ঝগড়া করে করেই পাড় করলেন। আমার আরও বেশী কিছু করে করে জীবন নদী পাড়ি দিতে হত। তার চেয়ে ভাল এখনই প্রাপ্য পাওনা দিয়ে বিদায় করা। বাবা আর কথা বলল না। একজন শুভাকাংখী কাজীর পরামর্শে বিভিন্নজনের কাছে তালাকনামাটি রেজিংষ্টার ডাকযোগে পাঠালাম। সাথে সাথে ফোনেও অনেক কে জানালাম। আমার ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জাবেদ আলী তালাকনামাটি গ্রহন না করে ফেরৎ পাঠাল। পুকুর পাড় থেকে একইভাবে আরেকটি ফেরৎ এল। আবার পাঠালাম গ্রামের মুরুব্বীদের কাছে। সেটি নিয়ে মুরুব্বীরা জাবেদ আলীর কাছে গেল। পড়ে শুনাল! ঈভা'র কাছেও ওরটা পৌঁছলো । বাড়িতে বলে দিলাম, ঈভা'র জিনিস পত্র যা যা আছে সব দিয়ে দিও। কাবিনের টাকার জামিন হতে বলে দিলাম ফালু কাকাকে। গ্রামের সম্মানীত মানুষ। সবাই যাকে শ্রদ্ধা করে। কাকা রাজী হলেন।

ঈভাকে তালাক দেওয়ার পর মেয়েপক্ষ আমার সীমাহীন দোষ বের করে প্রচার করা শুরু করল। আমার কঠোর পরিশ্রমের পয়সা দিয়ে ওদের যা যা করে দিয়েছি তা সব অস্বীকার করল! তাতেও তাদের ক্ষোভ মেটে না! আবীর রুবাইয়া আপার মত অত্যান্ত ভাল মানুষদেরও যাঁরা

আমাকে এ মেয়েকে খোঁজে পেতে সহযোগিতা করে, আমার চেয়ে বরং মেয়ে পক্ষেরই বেশী উপকার করেছিল তাঁদের বদনাম করা শুরু করল। তাঁদের উপর প্রচন্ড চাপ সৃষ্টি করল যাতে তালাক প্রত্যাহার করে নিই!

কাজীকে বলে দিল কেউ কাবিনের কপি নিতে আসলে যেন না দেয়। একবার এক লোক কাবিনের কপি আনতে গেলে তাকে মেরে ফেলার ভয় দেখিয়ে বিদায় করল! কি দাপট মেয়ে পক্ষের! তাদের মেয়ে অন্যায় করলেও তাকে নিয়ে খেতে হবে! তালাক দেওয়া যাবে না! এসব অসভ্য জানোয়ারদেরই কাজ। সভ্য মানুষ কখনও এরম করে না।এখন আমি বুঝতে পেরেছি, অসভ্য জানোয়ারদের জন্য বিয়েটা খুব প্রয়োজন। অন্যের ঘাড় মটকে খাওয়ার জন্যে। সভ্য মানুষদের সততাই তাদের সম্পর্ক টিকিয়ে রাখে।বিয়ের প্রয়োজন তাদের পরেনা। কেউ বিয়ে করলেও কোন কারণে মিল না হলে তারা কোর্টে গিয়ে ডিভোর্স লেটারে সই করে। তারা জানে একটাই জীবন। অপচয় করার কোন মানে হয় না। তাছাড়া, জোড়াতালি দিয়ে অনেক কিছু টিকিয়ে রাখা গেলেও সম্পর্ক টিকিয়ে রাখা যায় না। চোখের জলে বিদায় নেওয়ার সময়ও তারা ভদ্রতা প্রকাশে কার্পণ্য করে না। হ্যান্ডশেক করে। একে অন্যের জন্যে শুভকামনা করে।

হুমায়ূন ফরিদী তার প্রফেসর স্ত্রীকে তালাক দিয়ে অভিনেত্রী সুবর্ণা মোস্তফাকে বিয়ে করল। অসম্ভব ভদ্র বলেই প্রফেসর মহিলা টু শব্দটি করলেন না। হুমায়ুন আহমেদ তার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে মেয়ের বান্ধবীকে বিয়ে করল! নির্দোষ স্ত্রী চুপচাপ চলে গেল। কারণ মহিলা ভদ্র। অথচ, অপরাধীরা বড় গলায় কথা বলে! চোরের মার বড় গলা বলব, নাকি বেশ্যারা নির্লজ্যই হয় একথা বলব! পরেরটাই মনে হচ্ছে অধিক যুক্তিযুক্ত। বেশ্যাদের সাথে অনেক মাস্তানদের যোগাযোগ থাকে। কারণ তারা জানে তারা যে কাজ করে সেটা খারাপ কাজ। একাজ করলে ঝামেলা হবে তাই তাদের মাস্তানদের সাথে সম্পর্ক রাখা অত্যান্ত জরুরী। নিরীহ মানুষজনদের যাতে ভয় ভীতি হুমকি ধামকি প্রদর্শণ করে নিজের স্বার্থ অক্ষুন্ন রাখা যায়! আর এসব বিকৃত মন মানসিকতার মানুষের কল্যাণে অশিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত চাষাভূষা বা নোংরা বড় পরিবার থেকে আসা ছোট মানুষজন মেম্বর চেয়ারম্যান এমপি বনে যায়। জামির হোসেন থেকে জাবেদ আলী, জাবেদ আলী থেকে নান্টু বল্টু বা হান্নান এমপিরা একই সুঁতায় গাঁথা। এদের জালে সমাজ আটকে একই বৃত্তে ঘুরপাক খাচ্ছে। বেরুবার পথ নেই।

পুকুরপাড় থেকে লোকজন আসল। আমার মা বাবা প্রতিবেশী চাচীরা সব ঈভা'র পক্ষ নিল! আমার মা বলল,

Òবউ যখন নাঈদের সাথে কথা বলে আমি তখন সামনে ছিলাম। চাচীরা বলল, আমরাও ছিলাম! বউ এরকম কোন কথা বলে নাই!” সবাই একমত যে তালাক হয়ে গেছে। কিন্তু মীমাংসা হল না। পরের দিন মাকে জিজ্ঞেস করলাম , নাঈদ তোমার সাথে কথা বলতে চাইল, বাবা তোমাকে ডাকল কিন্তু তুমি আসলা না। লোকজনের সামনে কি করে বললা যে, আমি সামনে ছিলাম!? মা আমাকে বলে, Òকি করুম বাবা?” কি না করলা? আমাকে মিথ্যাবাদী বানালে। অন্যায়ের পক্ষ নিলা। মা সন্তানের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষী দিলে আর বাকী থাকে কি! সত্য কথা হলে আমার কোন দু:খ থাকত না। এ যে ডাহা মিথ্যে কথা। আমি সামনে ছিলাম!

মাস খানেক পরে ইউনিয়ন পরিষদের প্যাডে চেয়ারম্যান জাবেদ আলীর একটি চিঠি পেলোম, সে লিখেছে,

প্রাপক ঃ অপূর্ব ওরফে অপু
পিতা ঃ লোকনাম হাতিয়ানী
স্থায়ী ঠিকানা ঃ গ্রাম-হাতিয়া, পোঃ নদী পাড়, থানাঃ জমিদার গঞ্জ, জেলাঃ ঢাকা।

বিষয়ঃ আপনার ০৩.০৮.০৪ ইং তারিখের পত্রের জবাব প্রসঙ্গে।

“আপনাকে অবগত করা যাচ্ছে যে, আপনি আমার নিকট লিখিয়াছেন, আপনার সাথে আপনার স্ত্রী মেহেরুন্নাহার ঈভার বনিবনাত না হওয়ায় আপনি তাকে তালাক দিতে চাচ্ছেন।কিন্তু আমি খোঁজ খবর নিয়া জানিয়াছি যে, আপনার লিখিত জবানবন্দীর সাথে বাস্ত বিক ঘটনার অমিল রহিয়াছে। তাছাড়া আপনার তালাক দেওয়ার পদ্ধতি ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন বিরোধী। যদি আপনি আপনার স্ত্রীকে তালাক দিতে চান তাহলে যুক্তি সঙ্গত কারণ উল্লেখ করে বাংলাদেশ অ্যাম্বাসির মাধ্যমে কাজীর দ্বারা/ ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির দ্বারা তালাক নামা রেজিষ্ট্রেশন করিয়ে অ্যাম্বাসিডরের মাধ্যমে তালাক নামা সত্যায়িত করিয়া আমার নিকট প্রেরণ করলে আমি বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা নিব। অথবা, আপনি দেশে আসিয়া কাজী অফিসের মাধ্যমে তালাক দিয়া তালাকের অনুলিপি আমাকে দিলে আমি তখন বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা নিব।”

০৮.১০.০৪
জাবেদ হোসেন
চেয়ারম্যান
পাগলা ইউনিয়ন পরিষদ

ধর্মীয় বিশেষজ্ঞদের মতে তালাক হয়ে গেছে। তথাপিও সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণে অসাধু রাজাকার চেয়ারম্যান জাবেদ আলীর পত্রের জবাব দিতে, Òমুসলিম পারিবারিক আইনে তালাকের পদ্ধতি” সংগ্রহ করলাম। ধারা, উপধারা, চেয়ারম্যানের করণীয় ইত্যাদি উল্লেখ্য করে এ্যাম্বাসির মাধ্যমে সত্যায়িত করে তালাক নামাটি আবার পাঠালাম মুরুব্বীদের হাত দিয়ে । কিন্ত জাবেদ আলী সেটি গ্রহণ করল না।

আমার পক্ষে হাজী ফালু কাকা দৌড়ঝাঁপ করছে। নাজিম কাকা ঈভাকে বলল, Òতুমি আজকের মধ্যে এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে।” খবর পেয়ে মেয়ে পক্ষের আত্মীয় আমাদেরই গ্রামের আদম বেপারী পাঁচশ টাকার নাজ্জাক আলী এসে বাবাকে বলল, “অপু না ফেরা পর্যন্ত ঈভা এ বাড়িতেই থাকবে।” বাবা বলল, থাক! ফালু কাকা, নাজিম কাকা বাবার অভিপ্রায় বুঝতে পেরে হাল ছেড়ে দিলেন। পলকের নামে আল বারাকা ব্যাংকে একলাখ টাকা রেখেছিলাম তিন বৎসরের জন্য। মেয়াদ শেষে একলাখ ত্রিশ হাজার হবে। আর মাত্র ছয় মাস বাকী আছে । টাকাগুলো তোলে নিল ব্যাংক থেকে। ম্যানেজার সব জানে। আমিই তাকে জানিয়েছি। তাই টাকা দিতে চায় নি। ঈভা জানত জাবেদ আলী আমার শত্রু। সময় বুঝে জাবেদ আলীর সাথে হাত মিলাল। মেঘ না চাইতেই জাবেদ আলী বৃষ্টি পেল। ঈভা'র চৌদ্দগোষ্ঠীর সাথে জাবেদ আলী ক্যাডার বাহিনী নিয়ে ব্যাংকে গেল। জাবেদ আলী বলল, Òঈভা এখনও অপুদের বাড়িতেই আছে। মনোমালিণ্য চলছে! সব ঠিক হয়ে যাবে।! তাছাড়া মেয়ের একাউন্টের নমিনি ঈভা তো আপনি ওর টাকা দিচ্ছেন না কেন?” ভয়ভীতি প্রদর্শন করে টাকা তোলে নিল। ঈভা'র নামেও প্রতি মাসে এসডিপিএস একাউন্টে টাকা জমা দিতাম। সেটা আমার ধরা ছোঁয়ার বাইরে। এসব ঘটনা আমার মাধ্যমেই বাড়িতে জানাজানি হল। ঈভা জনৈক ভাবীকে বলেছে, Òযদি এ বাড়ি ছাইরা যাইতেই অয় তাইলে এইসব টাকা পয়সা সব দিয়াই যামু!” এখনও সতী সাবিত্রী , ভাল মানুষ সাজতে চায়! মানুষ চিনলাম না!

খবর পেলাম, দুবাই থেকে কবির এসেছে বাড়িতে। দুই মাসের ছুটিতে। প্রাণের ভাবী ! আদরের ভাস্তির জন্য কিছুই আনেনি তবুও দুজনের হাল দেখে মন গলে নদী হয়ে গেল! বাবা মা বোন সবার সামনে আমাকে যাচ্ছেতাই বলে গালিগালাজ করে ।ঈভা পলকের কাছে দেবতা হয়ে যায়! প্রতিবেশীরা শুণে কবীরের প্রশংসা করে!

আমাদের বিয়ের বয়স এখনও পাঁচ বৎসরে পা রাখেনি। এরই মধ্যে আমার শত্রু মিত্র সবার কাছেই আস্থাভাজন হয়ে গেছে! তালাকের পর থেকে সবাই আমাকে খারাপ

ভাবতে শুরু করেছে! সবাই ভাবছে বিদেশে এসে আমি বদলে গেছি, নষ্ট হয়ে গেছি! আগের মত আর নেই! তাই ঈভা'র মত ভাল একটা মেয়েকে তালাক দিচ্ছি! সুভাকাংখীরা যাতে আমাকে ভুল না বুঝে তাই আগ বাড়িয়ে নিজেই সবাকে ঘটনা জানাচ্ছি। অথচ কেউই আমাকে বিশ্বাস করতে চায় না! আমাকে জেরা করে। মানসিক ভাবে চাপ সৃষ্টি করে। আমার নিজের কানে শুনা কথা তারা না শুনেই উল্টে দিতে চায়! আমাকে বলে, Òলাইন খারাপ ছিল! কথা ঠিক মত বুঝা যায় নাই! তাই আপনি ভুল বুঝেছেন!

ঠিক করলাম আর কাউকে বলে নিজের যন্ত্রণা বাড়াব না। খেতে পারি না। কিন্তু কাজ ঠিকই করতে হয়। শুকিয়ে অর্ধেক হয়ে গেলাম । মালিক জিজ্ঞেস করে Òকি হয়েছে?” কিছুনা! বনাঞ্চলের মত মন সেই অমানুষ চঞ্চলও একদিন বলে, Òআপনার কি হইছে!? চেহারাটা আয়না দিয়া দেখছেন? খালি পয়সা জমাইয়েন না, কিছু খাইয়েনও!”

পলক আমার সারাক্ষণের ভাবনা। ভাবছি, সমস্যা মিটে গেলে দেশে ফিরে যাব। মেয়েকে নিয়েই বাকী জীবনটা পাড় করে দেব। কিন্তু সমস্যা মিটে না ঝুলে থাকে। মেয়েকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে বাঁচতে চায় ঈভা! পলকের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত হই। মেয়ের উপর অধিকার দুজনেরই সমান। ঈভা ভেবেছিল, আমি মেয়েকে নিয়ে কাড়াকাড়ি করব! এ সুযোগে ফায়দা লুটবে ও! আমার কথা নিয়ে যাও অথবা দিয়ে যাও।যে কোনটাতেই আমি রাজী। ছোটবেলায় আলাদা হয়ে গেলে মেয়ের উপর তেমন কোন প্রভাব পড়ত না। কিন্তু মেয়ে বড় হলে যখন সব বুঝতে পারবে তখন এ অবস্থা দেখলে যন্ত্রণা ওকে সারাজীবন কুঁড়ে কুঁড়ে খাবে। মেয়ের জীবনের বিনিময়ে ঈভা নিজের জীবন চায়!

বাড়ির সবাই আমার চেয়ে ঠেলাওয়ালা আকবর আলীদের বেশী পছন্দ করে! আকবর আলীদের জন্য চুন্নু আমার সাথে ঝগড়া করে! এক বৎসর বাড়ির বাইরে কাটালাম আমি! লেখালেখির ভাল হাত ছিল আমার কিন্তু ওদের বাঁধার কারণে এগুতে পারলাম না। অমানুষ জাবেদ আলীর বিপক্ষে কাজ করার সময় গ্রামের সবার সাথে আমার পরিবারও ভয়ংকর দানব হয়ে সামনে দাঁড়াল! সর্বশেষ, আমার স্ত্রীকে আমি তালাক দিয়েছি ছোট ভাইরা সে তালাক মানেনা! বাবা মা বোন অন্য বাড়ির মেয়ের পক্ষ নেয়! আমাকে বাড়ির বাইরে বের করে দিয়ে পরের মেয়েকে বাড়িতে জায়গা দিয়েছে! সবাকে যদি জিজ্ঞেস করি আমার দোষটা কি? কেউ বলতে পারবে না!

আপনকে বুকে লাথি মেরে দুরে সরিয়ে পরকে বুকে টেনে নেওয়ার কারণটা আমার কাছেও পরিস্কার নয়।

তালাকের তিন বৎসর পরেও হাতিয়া আছে কিসের আসায়! আমার বাবা মা ভাই বোন, চেয়ারম্যান জাবেদ আলী, পাঁচশ টাকার নাজ্জাক আলী ; কেউই ওর জন্য কিছুই করতে পারবে না। যৌবন শেষ হয়ে গেলে একদিন পথের ভিখারিনীদের মাঝে আবিস্কার করবে নিজেকে। মনে কষ্ট নিয়েও ভাল আছি। কারণ আমার কোন আশা নেই। ভরসা নেই। স্বপ্ন নেই। শুধু এই বইটা প্রকাশ করে মরতে পারলেই শান্তি। অন্তত পলক আমাকে ভুল বুঝবে না।

এই সমাজের সবাই ধার্মিক! ধর্মের বিপক্ষে কথা বললে সবার মাথায়ই রক্ত উঠে যায়। খুন করার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করে! আমার বাবা হাজী, ছোট ভাইরা নামাজী! চেয়ারম্যান জাবেদ আলী র মতো বেনামাজী লোকেরা সমাজের খুঁটি, চালক, মাথা! ধর্মীয় বিধান মতে বিয়ে করে ধর্মীয় বিধান মতেই তালাক দিয়েছি। ধর্মের কোন বিধানে আছে, তালাকের তিন বৎসর পরেও এভাবে থাকার বা রাখার নিয়ম !

এ সমাজে ধর্ম কেউ মানেনা। ধর্মের নামে এরা ব্যবসা করে। ধর্মকে ব্যবহার করে উপরে উঠার সিঁড়ি হিসেবে। দোষ শুধু তসলিমা নাসরিনদের!

পলকের জন্য কষ্ট হয়। আমার সমস্ত স্বপ্ন ,সম্ভাবনাময় একটি জীবন অঙ্কুরেই ঝরে গেল।

এখন আমার কিছুই নেই।টাকা পয়সা, বাড়ি ঘর, আপনজন। তবে মনে শান্তি আছে। জীবনে অন্যায়কে প্রশ্রয় দিই নি!

প্রিয় পলক

মা মণি আমার। তোমাকে কিছু বলার আছে আমার। দেখা যদি না হয়! এ আশঙ্কায় লিখে যাচ্ছি। জীবনে অন্যায়কে প্রশ্রয় দিই নি। বরং প্রতিবাদ করেছি। ঘরে বাইরে প্রচন্ড বাঁধার কারণে বেশী দূর এগু তে পারিনি। সীমাহীন ক্ষতি হয়েছে আমার। তবুও আপোষ করিনি অন্যায়ের সাথে। নিজের কাছে আমি একশ ভাগ সৎ।ভাল মানুষ এবং নির্দোষ।

হুট করে কোন কাজ করো না। বিয়ে তো নয়ই। গু রুত্বপূর্ণ যে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে দীর্ঘ সময় নিয়ে কয়েকদিন অন্তর বিষয়টি সিরিয়াসলি ভাববে। তারপর

সিদ্ধান্ত নেবে। কাউকে বিশ্বাস করো না। কারও প্রলোভনে পা দিও না। নিজের পায়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করবে। সব সময় ভাববে এই পৃথিবীতে তোমার কোন আপনজন নেই। তুমি একা। তাতে সাহস এবং শক্তি দুটোই বাড়বে। এই পৃথিবীতে বাঁচার জন্যে এ দু'টো খুবই প্রয়োজন। জনপ্রিয়তার স্রোতে গা ভাসিয়ো না। পৃথিবীতে ব্যতিক্রম কিছু করে একটা দাগ রেখে যাবার চেষ্টা করো। ভাল ভাল লেখকদের বই পড়বে। বিজ্ঞান এবং আধুনিক প্রযুক্তির সান্নিধ্যে থাকবে। প্রচলিত ধর্ম নিয়ে ভুলেও মাথা ঘামাবে না।

মায়ের পায়ের তলে সন্তানের বেহেশত নেই। তবে অনেক মায়ের পায়ের তলে সন্তানের জন্য নরক থাকে। মাতৃভক্তি বা পিতৃপুজার চেয়ে জ্ঞান সাধনা অনেক ভাল। কখনও পেছন ফিরে তাকাবে না, ভুলেও না।

আমার সারাজীবনের অভিজ্ঞতার নির্যাসটুকু তোমাকে দিলাম। মানতে পারলে উপকৃত হবে। তোমার সমবয়সীদের থেকে চল্লিশ বৎসর এগিয়ে থাকবে। না পারলে চরম মাশুল দিতে হবে। তোমাকে শুরু করতে হবে চল্লিশ বৎসর পেছন থেকে, যেখান থেকে সবাই শুরু করে।

ইতি
তোমার চিরদুঃখী বাবা